কন্যাশিশু

Good Neighbors Bangladesh

Plan

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

জানুয়ারি- ২০১৩

কন্যাশিশু-৯

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৩ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

প্রচ্ছদ
সাইফুল সরোয়ার

প্রকাশকাল
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

প্রকাশক
জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
৩/৭, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ৮১১২৬২২, ৮১২৭৯৭৫
ফ্যাক্স: ৮১১৬৮১২
www.girlchildforum.org

মেহের আফরোজ চুমকী, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মুখবন্ধ

কন্যাশিশুর অধিকার এবং নিরাপত্তাকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ৩০ সেপ্টেম্বর 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' পালিত হচ্ছে। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ ছাড়া এ দিবস পালন উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের উদ্যোগে দেশবরেণ্য লেখকদের মূল্যবান ২০টি নিবন্ধ নিয়ে 'কন্যাশিশু-৯' শিরোনামে একটি বিশেষ সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সংকলনে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও তাদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। একইভাবে তাদেরকে আরও সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, প্রত্যয়ী ও সর্বোপরী সকল বাঁধা-বিঘ্ন কাটিয়ে বিশ্ব বিজয়ী হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সংকলনটি কন্যাশিশুদের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমাদের কন্যাশিশুরা সামাজিক নানান প্রথা ও পরিবার প্রধানের অবহেলার কারণে পুত্রসন্তানের তুলনায় কম সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ছাড়া শিশুবিবাহের কারণে কন্যাশিশুদের বিরাট একটা অংশ ও সুযোগের অভাবে ঝরে পড়ে শিক্ষা জীবন থেকে। দেশে মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণও এই শিশুবিবাহ। বর্তমানে ৬৪.৩ শতাংশ বাংলাদেশি বিবাহিত কিশোরী কৈশোরে গর্ভধারণ করে।

অনিরাপদ গর্ভপাতজনিত কারণে কিশোরী ও কম বয়সী নারীরা দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক জটিলতায় মৃত্যুঝুঁকি ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই শিশুবিবাহ রোধ ও কন্যাশিশুদের উন্নয়নে কৌশলগত ও দ্রুত বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কন্যাশিশুদের বিয়ের নুন্যতম বয়স ১৮ বছর নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের উন্নয়নে তাদের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা প্রদানে অত্যন্ত আন্তরিক। কন্যাশিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হবে সরকারের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ সবাই মিলে কন্যাশিশুকে সমান সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, কন্যাশিশুরা যদি মানসম্মত শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি

পায়, তবে সে উপার্জনক্ষম এবং স্বাবলম্বী নারী হিসেবে বেড়ে ওঠতে পারবে। তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা তৈরি তথা সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কন্যাশিশুর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

'কন্যা মানেই বধূ নয়; করবে তারা বিশ্ব জয়' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবারের দিবস পালন সার্থক হোক। দিবসের সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

মেহের আফরোজ চুমকী, এমপি

২৬-০৯-২০১৩

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সভাপতি
জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সম্পাদকীয়

আজকের কন্যাশিশুই আগামী দিনের একজন নারী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়ামক শক্তি তথা শিক্ষক। কারণ ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে ওঠে একজন মাকে কেন্দ্র করে। তাই মানসম্মত শিক্ষা ও পরিমিত খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে কন্যাশিশুদের গড়ে তোলা প্রয়োজন। অথচ ইউনিসেফ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, একুশ শতকে এসেও বাংলাদেশের ৬৬ শতাংশ কন্যাশিশু শিশুবিবাহের শিকার, যারা উচ্চশিক্ষা, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুশিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়। একইসাথে তারা বঞ্চিত হয় আয়ের সুযোগ, আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য প্রবাহ থেকেও।

শিশুবিবাহ একদিকে আইন এবং সংবিধানের লঙ্ঘন, অন্যদিকে বর ও কনেকে বঞ্চিত করে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে। এটি পারিবারিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনেও সহায়ক হয়। শিশুবিবাহের শিকার হওয়া কন্যাশিশুটি স্বামী, সংসার ও শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে বুঝে ওঠার আগেই সংসার এবং পরিবারের ভারে আক্রান্ত হয়। শিশুবিবাহের কারণে কিশোরীরা জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কে বাধ্য হয়, যা কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর শিশুবিবাহের সাথে জড়িত সমস্যা শুধু গর্ভবর্তী মা ও ভ্রুণকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, শিশুর জন্মের পরও তা অব্যাহত থাকে। শিশুবিবাহের শিকার হওয়া নারীরা শতকরা ৪৫ ভাগ কম ওজন ও খর্বাকৃতির (Stunted) শিশুর জন্ম দেয়। আর এই দুর্বল ও পুষ্টিহীন শিশুরা জাতির ভবিষ্যত অগ্রগতির জন্য বাধার কারণ হতে পারে। এছাড়াও ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী গর্ভবতী মায়েদের তুলনায় ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে পাঁচগুণ বেশি। সর্বোপরি শিশুবিবাহের কারণে প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও সহিংস আচরণ কন্যাশিশুদের জীবনকে স্থায়ীভাবে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

তাই শিশুবিবাহ বন্ধে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এ সংক্রান্ত আইনের আধুনিকায়ন ও তা বাস্তবায়নে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া দরকার। শিশুর অধিকার সুরক্ষায় দরকার আইন বাস্তবায়নকারীদের আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও আইন মানার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ইউনিয়ন তথ্যসেবা প্রদান কেন্দ্র থেকে শিশুবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর লিফলেট বিতরণ, ডকুমেন্টারী শো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিশোরীদের জন্য নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে।

একইসাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। সর্বোপরি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে আপামর জনতার মাঝে গণসচেতনতা তৈরি করা।

আশার দিক হলো- শিশুবিবাহ বন্ধ করে কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিগত এক দশকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এখন সোচ্চার। এসব সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ফোরাম কন্যাশিশুদেরকে শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, উৎপাদনশীল, মর্যাদাবান করে গড়ে তোলা এবং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আরও আশার কথা হলো যে, বর্তমানে ফোরামের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর ফলে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে ইতিবাচক নীতি ও আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

কন্যাশিশু তথা নারীদের প্রতি বঞ্চনা ও নিগ্রহের অবসান ও তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে ফোরাম এর উদ্যোগে প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয়ভাবে কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ উদ্যোগে প্রতি বছরই যুক্ত হচ্ছে অসংখ্য সচেতন মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান। এ বছরও 'শিশু কন্যার বিয়ে নয়- করবে তারা বিশ্ব জয়' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয়ভাবে কন্যাশিশু দিবস পালন করা হচ্ছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের আয়োজনে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, র‍্যালি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ও নিজস্বভাবে 'কন্যাশিশু' শিরোনামে একটি বিশেষ সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় এবারও 'কন্যাশিশু-৯' সংকলনটি প্রকাশিত হলো। নিবন্ধসমূহে দেশের খ্যাতনামা লেখক, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, উন্নয়নকর্মীগণ বিদ্যমান সমাজে কন্যাশিশুদের অবস্থা ও অবস্থানের নানান দিক তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিগত কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিশুবিবাহের কারণ ও প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় নিয়ে কথা বলেছেন। সংকলনে মোট ২৫টি নিবন্ধ রয়েছে। পূর্বের ন্যায় এবারও নিবন্ধসমূহ লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'প্রথম আলো ভাষারীতি' অনুসরণ করা হয়েছে। সংকলনটির জন্য নিবন্ধ সংগ্রহ এবং জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সদস্য ও কার্য-নির্বাহী কমিটির তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কন্যাশিশুদের জন্য একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় যে সকল লেখক তাদের মূল্যবান নিবন্ধ পাঠিয়ে সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

আমাদের বিশ্বাস, সংকলনে প্রকাশিত মূল্যবান দিক-নির্দেশনামূলক লেখাগুলো কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন আরও অর্থবহ ও বেগবান করবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

সূচিপত্র

১. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী- টলস্টয়ের সেই শিশু

২. অধ্যাপক হান্নানা বেগম- সক্ষমতার শিক্ষা

৩. আইরীন নিয়াজী মান্না- নিয়মের ঘেরাটোপে নারী: অধিকারের আন্দোলন যেন রুটিন ওয়ার্ক

৪. ওয়াহিদা বানু স্বপ্না- অরক্ষিত পাখিরা

৫. চিররঞ্জন সরকার- শিশু যৌন হয়রানি

৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান- কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য নয়

৭. তপতী সাহা- প্রসঙ্গ নারীমুক্তি ও শ্রেণী বৈষম্য

৮. দিল মনোয়ারা মনু- সাংবাদিকতায় নারীর এগিয়ে চলা সমাজ বিকাশের অন্যতম বড় শর্ত

৯. নাছিমা আক্তার জলি- আর কোন কন্যাশিশু যেন ঐশী না হয়ে ওঠে

১০. ফরিদা আখতার- কন্যা যখন মা হয়ে যায়

১১. বৃত্বা রায় দীপা- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০, একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ

১২. বাবুল চন্দ্র সূত্রধর- আমাদের কন্যাশিশুরা আমাদের মায়েরা

১৩. বিপ্লবী রানী দে রায়- শিশুবিবাহ বন্ধে প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা

১৪. বিলকিস নাহার- একজন সুপ্তীর কথা

১৫. মোঃ আহছান জাকির মিঠু- কন্যাশিশু ও নারী: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

১৬. মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত- শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের অগ্রযাত্রার পথে অন্যতম বাধা

১৭. রওশন জাহান- শিশুবিবাহ প্রথা বিলোপ: কন্যাশিশু দিবসে প্রত্যাশা

১৮. শীপা হাফিজা- শিশুবিবাহ: কারণ ও প্রতিকারের উপায়

১৯. শারমিন মুস্তারী- কন্যাশিশু : দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে কিছু করণীয়

২০. সুতপা বেদজ্ঞ- রাজনীতি ও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ

২১. সালমা খান- কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ক্ষমতায়নের কৌশলগুলো

২২. সেলিনা হোসেন- দিগন্ত ছুঁতে চায় মেয়েশিশুরা

২৩. সোমা দেব- নেশা থেকে অপরাধ: বিপথ অথবা বিপদগামী কন্যাশিশু

২৪. সুং হিয়ং লি- শিশুবিবাহ রোধে প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগ

২৫. হীমেল নীভা সরকার- স্বাধীন দেশ পরাধীন জীবন

টলস্টয়ের সেই শিশু

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

টলস্টয়ের সেই গল্পটা খুব ছোট এবং ভারী সুন্দর। দু'টি শিশু ঝগড়া করেছে, যেমন শিশুরা সবসময়ে করে; তারপরে তারা ঝগড়া মিটিয়েও ফেলেছে, যেমনটা শিশুরা পারে। কিন্তু ওই দুই শিশুর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন? না, তারা মেটায় নি, তারা কিন্তু ঝগড়া করেই চলেছে। গল্পের শিরোনামটাও সুন্দর, 'শিশুরা বড়দেরকে শেখাতে পারে।'

কিন্তু বড়রা শেখে কি? না, শেখে না। মুশকিলটা সেখানেই। বড়রাই ছোটদের শেখায়, ছোটরা বড়দেরকে শেখাতে পারে না। ছোটরা বরঞ্চ চায় তারা বড়দের মতো হবে। ব্যাপারটা আসলে চাপিয়ে-দেয়া। বড়রা বড়, তাদের ওজন বেশি, শক্তি বেশি, তারা নিজেদেরকে চাপিয়ে দেয় শিশুদের ওপর। বড়দের ঝগড়া-ফ্যাসাদ, কলহ-বিবাদ সব গিয়ে ভর করে ছোটদের ওপর। শুধু তাই নয়, বয়স্কদের যত ব্যর্থতা, যত রকমের অপারগতা তার সবটা গ্লানি গিয়ে আঘাত করে শিশুদেরকে। চাপে ও আঘাতে শিশুর জগৎটা বড় সহজে, বড় অল্পসময়ে ভেঙ্গে যায়। আর যদি একেবারে নাও ভাঙ্গে, তবুও দুমড়ে-মুচড়ে যায়। সোজা থাকে না, বেঁকেতেড়ে বিশ্রী হয়ে ওঠে।

হারিয়ে গেলে অনেক কিছুই আবার ফেরত পাওয়া যায়। টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি, গাড়ী-ঘোড়া এসব নিখোঁজ হলেও আবার খুঁজে পাওয়া যাবে, আশা থাকে। বন্ধুত্বও একবার ভাঙ্গলে আবার গড়ে উঠবে বলে ভরসা করলেও করা যায়। কিন্তু যেমন সময়কে আর ফেরত পাওয়া যায় না, তেমনি ফেরত পাওয়া যায় না নষ্ট শৈশবকে। শিশুর যদি ক্ষতি হয় তাহলে তার আর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। গেছে তো গেছেই চলে। শিশুর ক্ষতি হতে পারে শরীরে, ক্ষতি হতে পারে মনে। এই ক্ষতি আর কখনো পূরণ হবার নয়। যে শিশুর স্বাস্থ্য শৈশবে গেল নষ্ট হয়ে, সারাজীবন তাকে স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগতে হবে। যে-শিশুর মন গেছে দুমড়ে, তাকে সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়েও আবার যে সুস্থ ও স্বাভাবিক করা যাবে সে উপায় থাকে না। ভাঙ্গা কাচ আবার জোড়া লাগে, কিন্তু ভাঙ্গা শৈশবকে আর জোড়া লাগাবার উপায় নেই। কাঁচের সঙ্গে তুলনাটা সহজেই আসে। কাচ যেমন সহজে ভাঙ্গে, শিশুর শৈশবও তেমনি সহজে ভেঙ্গে যায়, সে বড়ই দুর্বল, বড়ই ভঙ্গুর। ভাঙ্গা কাচ ভারী বিপজ্জনক, ভাঙ্গা শৈশব কিন্তু আরও বেশি মারাত্মক- শিশুর নিজের জন্য যেমন, তেমনি গোটা সমাজের জন্য। শিশুকে পীড়া দিয়ে আমরা সবাইকে পীড়া দিই, যেমন আজকের মানুষকে, তেমনি ভবিষ্যতের মানুষকেও। কেননা শিশুরাই মানুষের ভবিষ্যৎ। আমাদের দেশ ভগ্ন শৈশবে ভরপুর, সেজন্য আশংকা হয় যে, আমাদের ভবিষ্যতও অত্যন্ত বিপন্ন।

কিন্তু পীড়াটা দিচ্ছে কে? শিশুকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, পীড়া দেয় বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, স্কুলের শিক্ষক, পাড়ার বন্ধু, সবক্ষাই। দু'টো কথা আছে। একটা হলো, মানুষ জন্মে স্বাধীন হয়ে, জন্মের পরে দেখে পদে পদে সে পরাধীন। আরেকটা কথা, মানুষ জন্মে পরাধীন হয়ে, জন্মের পর তাকে স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হয়, যত্ন করে,

শিখে শিখে, ঠেকে ঠেকে। শিশুর বেলায় এই দু'টো কথাই সত্য। সে বড়ই পরাধীন। স্বাধীন হয়ে জন্মায় কি? হ্যাঁ, সে মনে করে সে স্বাধীন। যা ইচ্ছা তাই করবে। কিন্তু তাই কি? চারদিকে তো নিষেধ তার, মস্ত মস্ত নিষেধ। এটা করো না, ওটা করো না। তার নিজের ভেতরে তো নিষেধ আছেই, সে-নিষেধ হচ্ছে তার অপারগতা; ছোট্ট সে, ভীষণভাবে পরনির্ভর। কিন্তু বাইরের নিষেধগুলো অনেক বড়, অনেক বেশি। এসব বাধা পার হয়ে তবে সে-স্বাধীন হবে। বড়ই কঠিন সে-কাজ।

নিষেধগুলো দু'রকমের। এক রকমের নিষেধ আছে যেগুলো শিশুর ভালোর কথা ভেবেই করা হয়ে থাকে। যেমন, আগুনে হাত দিয়ো না, পুড়ে যাবে। পানিতে নামতে নেই, ডুবে মরবে। এই নিষেধগুলো শিশুকে রক্ষা করতে চায়, যদিও নিষেধ, সেহেতু এগুলোও নেতিবাচক একটা ঘটনা ঘটায় শিশু মনস্তত্ত্বে; কিন্তু আরও এক ধরনের নিষেধ রয়েছে যেগুলোতে ইতি নেই, নেতিই শুধু রয়েছে, যারা ভয়ংকর রকমের ভয়ংকর। এদেরকে বলা যায় বঞ্চনা। শিশুকে বঞ্চিত করা হয় খাদ্য ও আশ্রয় থেকে। আলো পায় না, শিক্ষা পায় না। তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। এসব বঞ্চনা শিশুকে শিশু রাখে না, পঙ্গু বিকৃতিতে পরিণত করে।

এই বঞ্চনাগুলো কে করছে? দায়ী কে? অবোধ শিশু মনে করবে তার আপনজনেরাই করছে। দায়ী তার বাবা-মা, দায়ী তার আত্মীয়-স্বজন। তা বটে। দায়ী সরাসরি তারাই। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই তো নিজেরাই বঞ্চিত। তারা দরিদ্র, তারা অসহায়। জগৎ তাদের অপমানিত করে, করে লাঞ্ছিত। তারা কি করে যত্ন নেবে শিশুদের? রক্ষা করবে তাদেরকে?

পারে না। আসলে শিশুর শত্রু তার বাবা-মা নন, শিশুর শত্রু গোটা পরিবেশ। বাবা-মা নিজেরাও এই পরিবেশেরই শিকার। তাঁরাও অসহায়, এক্ষেত্রে তাঁরা যেন বয়স্ক শিশুই একেকজন, তেমনি নিরুপায় ও পরাধীন। পরিবেশের কথা বললাম, পরিবেশ আবার দু'ধরনের। প্রাকৃতিক ও সামাজিক। খরা, বন্যা, ঝড়, অজন্মা- এসব হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর সামাজিক পরিবেশ বলতে যা বোঝায় সেটা আসলে খুবই ছড়ানো, কেননা এর মধ্যে কেবল সমাজ নেই, দেশের অর্থনীতি আছে, রাষ্ট্রও রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গেও সামাজিক পরিবেশের যোগ থাকে। যেমন, ধরা যাক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দুর্যোগ অন্যদেশে যে হয় না তা নয়, কিন্তু আমাদের মতো গরীব দেশে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে-রকম ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে ধনী দেশে মোটেই তেমন প্রলয়কাণ্ড ঘটতে পারে না। প্রকৃতিকে মানুষ নিজের কাজে যখন লাগায় তখন তাতে অস্বাভাবিকতা থাকে না, দুর্দশা ঘটে তখনই যখন মানুষ তা পারে না, যখন পরিবেশই বরঞ্চ মানুষকে শাসন করে। ওই না-পারাটা একটা আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা।

আর যে কোনো দুর্যোগ- সে প্রাকৃতিকই হোক কিংবা আর্থ-সামাজিকই হোক- সে গিয়ে আঘাত করে শিশুকে। বিশেষ করে গরীব দেশে। শিশুই কষ্ট পায় বেশি এবং সর্বাগ্রে। দেখা যায় তাকে রক্ষা করার কেউ নেই, কোথাও নেই। বাবা-মা পারেন না। ইচ্ছা থাকে না।

বাংলাদেশে আমরা বাস করছি একটি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায়। এই সমাজের স্বভাব হলো সবকিছুকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা, এবং সবকিছুতে মুনাফা খোঁজা। শিশুও এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বটে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শিশুর দায়িত্ব সমাজ নেবে না, ব্যক্তিকে, অর্থাৎ শিশুর অভিভাবককেই নিতে হবে। অধিকাংশ অভিভাবকই হচ্ছেন দরিদ্র, তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তারা কি করে যত্ন নেবেন শিশুর? যত্ন নিতে পারেন না, ফলে শিশুর মতো করে যত্ন নেন না। শিশুকে সম্পত্তি হিসেবে দেখেন। যেমন করে নিজের বাড়িটাকে বাড়িয়ে তোলেন, নিজের গাড়িটাকে ঝাড়মোছা করান তেমনি শিশুটিকেও সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে চান। এতে তার মুনাফার আশা। মান বাড়বে, সম্মান হবে, লোকে তাকে হিংসা করবে- যেমন তার বাড়িটা দেখে করে, কিংবা করে গাড়িটা

দেখে। আর ভাবেন ভবিষ্যতে এই শিশু আয় করবে প্রচুর। তখন এখন যা খরচ করলেন সুদাসলে তা উসুল হয়ে যাবে।

ওদিকে শিশুটি যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে। সে অন্যদেরকে বন্ধু হিসেবে না-দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে। ওটাও পুঁজিবাদের রোগ। পুঁজিবাদ কেবল নিজেকে দেখতে শেখায়। এই ব্যবস্থায় শিশুর যে শিক্ষাটা হয় সেটা অন্যকিছুর নয়, স্বার্থপরতার। সে নিতে শেখে, দিতে শেখে না।

আমরা গরীব দেশের শিশুর বিকৃত শিক্ষাটা দেখছি। পুঁজিবাদের অধীনে ধনী দেশের ছেলে-মেয়েরাও কিন্তু ওই একই শিক্ষা পায়- স্বার্থপরতার শিক্ষা। সেখানে ব্যক্তি ব্যক্তিগত হতে হতে এতোই ব্যক্তিগত হয়ে পড়ে যে, বাবা-মা'ও সহ্য করা কঠিন মনে করেন একে অপরকে। ফলে দেখা যায় তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন; শিশুরা ভয় পায়, ভয়ের মধ্যে থাকে, তার বন্ধুর বাবা-মা আলাদা হয়ে গেলেন, না জানি কবে তার নিজের বাবা-মা দু'জন দু'দিকে যান চলে। আর রয়েছে মাদকাসক্তি। রোগের মতো তা ছড়িয়ে গেছে। সংক্রামক ব্যাধি। ব্যবসায়ীরাই ছড়াচ্ছে, মুনাফার লোভে। সমাজে রয়েছে নির্মম প্রতিযোগিতা, অমানবিক হিংস্রতা, অতি নিম্নস্তরের স্বার্থপরতা- এইসব রোগ শিশুর স্বাস্থ্যকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করছে। দেখা যাচ্ছে, শিশু নিরাপদে নেই সেখানেও। বোঝা যায়, পুঁজিবাদ মানুষের কত বড় শত্রু।

ধনী দেশ যে ধনী হয়েছে সেই-বা কিভাবে? ধনী হয়েছে গরীব দেশকে বঞ্চিত ও লুণ্ঠন করে। দেশের ভেতরে যেমন সম্পত্তিবান কেড়ে নেয় সম্পত্তিহীনের মুখের গ্রাস, আর্ন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাতেও ঠিক তাই ঘটে। ঘটেছে। পৃথিবীর যা সম্পদ- তা সাম্রাজ্যবাদীরাই নিয়ন্ত্রন করে। নির্ভরশীল দেশগুলো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নয়। আর এই যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রম মাত্র। নির্ভরশীলরা মনে করে তারা স্বাধীন, কিন্তু তারা জানে না, কিংবা জেনেও জানতে চায় না যে, তারা গভীরভাবে ও প্রকৃত অর্থে পরাধীন; নির্ভরশীলতা আসলে পরাধীনতারই নামান্তর। বঞ্চনা ও লুণ্ঠনের মুখে গরীব দেশগুলো গরীব হয়েই থাকছে এবং পরিণামে তার শিশুরা পঙ্গু হচ্ছে অতি শৈশবেই। শিশুকে টিকা দিয়ে দেহের রোগ থেকে বাঁচানো যাবে, কিন্তু দারিদ্রের রোগ সারাবার ব্যবস্থাটা কি? সেই টিকা কোথায় পাওয়া যাবে? সাম্রাজ্যবাদ সব বয়সের মানুষের শত্রু, কিন্তু সবচেয়ে বড় শত্রু সে মানবশিশুর।

রাষ্ট্রের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক পিতামাতার সঙ্গে তার সম্পর্কের তুলনায় কম শক্তিশালী নয়। ধনী রাষ্ট্র গরীব রাষ্ট্রের ধনসম্পদ কেড়ে নিচ্ছে। ওদিকে গরীব রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে আবার গরীব পিতামাতারা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মানবিক প্রাপ্য থেকে। আর এই যে বঞ্চনার বিকট বোঝা সেটা চেপে বসে রয়েছে অসহায় শিশুর ছোট্ট কাঁধটিতে। ব্যাপারটা খুবই ভয়াবহ।

১৯৯০তে শিশুদেরকে নিয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে। জাতিসংঘের দপ্তরে সত্তরটিরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান মিলিত হয়েছিল শিশুদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। কাজটি ছিল একাধিক দিক দিয়ে সঙ্গত। প্রথমত, শিশুর ভাগ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির যোগাযোগ খুবই গভীর। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কও শিশুর জন্য ভারী গুরুত্বপূর্ণ। দুধের খালি বোতল নিয়ে ইরাকী শিশুরা শোভাযাত্রা করেছে বিদেশী দূতাবাসমুখী। তারা দুধ চায়। কে কেড়ে নিলো দুধ? কেড়ে নিয়েছে তাদের রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবরোধ। তৃতীয়ত, বিষয় হিসেবে শিশুদের অবস্থা খুবই জরুরি বিবেচ্য।

আমরা জানি জাতিসংঘ বিশ্বের বড় বড় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়। শিশুরা দেখতে ছোট, কিন্তু মূল্যে খাটো নয়। বস্তুতঃ শিশুর চেয়ে বড় বিষয় আর কী হতে পারে? শিশু একদিন বড় হবে। না, কেবল বড় হওয়াটা নয়, কেমনভাবে কতটা বড় হবে সেটাও জরুরি, খুবই জরুরি পশ্ন, আর ওই জরুরি প্রশ্নের মীমাংসা আজকেই, এখনই

হতে হবে। জাতিসংঘ যুদ্ধের ভয়ে শঙ্কিত। কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপীই তো একটা যুদ্ধ চলছে, সেটা ঠাণ্ডা ও নীরব যুদ্ধ, কিন্তু একটা সার্বক্ষনিক যুদ্ধ বটে। এ হচ্ছে শিশুর সঙ্গে তার পরিবেশের লড়াই। পরিবেশ সব দেশে সমান শত্রু নয়, কোথাও কোথাও সে শিশুর মিত্র হবার জন্য খুবই চেষ্টা করে, কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলোতে- তা সে দেশ ধনীই হোক, কিংবা গরীবই হোক- পরিবেশের স্বভাবটাই হচ্ছে শত্রুতার।

আমরা শিশু অপরাধের কথা শুনি। কোনো শিশুই অপরাধী নয় আসলে, অপরাধী হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত শিশুর প্রতি অপরাধ করে চলেছে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিজের অপরাধকে শিশুর অপরাধ বলে চিহ্নিত করছে। সমগ্র পরিবেশ শিশুর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেই যুদ্ধে আমরা কেউই কিন্তু নিরপেক্ষ নই; হয় আমরা শিশুর পক্ষে, নয়তো তার বিপক্ষে। আর যদি পক্ষে হই তাহলে ওই যে শিশুর শত্রুপক্ষ- আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা- তাকে বদলে ফেলতে হবে। এখন যে দৈত্য হয়ে রয়েছে তাকে পরিণত করতে হবে মিত্রে।

ব্যবস্থা সহজে বদলাবে না। তার বিরুদ্ধে লড়াইটা একটা সর্বাত্মক লড়াই বটে। ইতিমধ্যে শিশুর পক্ষে দাঁড়িয়ে যে দাবীগুলো আমরা তুলতে পারি তা হচ্ছে, রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে শিশু যাতে শিশুর জগতে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করার। শিশুকে দিতে হবে পুষ্টি, নিরাপত্তা ও শিক্ষা। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা চাই। শিশুর সুস্থ বিকাশের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় গড়তে হবে। সেই সঙ্গে তার খেলাধুলা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে শিশুপার্ক ও শিশু গ্রন্থাগার দরকার। আমাদের সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত নীচু, শিশুকে তার শৈশবেই সঙ্গীত, অভিনয়, আবৃত্তি, নৃত্য- এসবে উৎসাহিত করা চাই, যাতে করে সে নিজের ভেতরকার প্রতিশ্রুতিকে বিকশিত করতে এবং একই সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক মানকে ভবিষ্যতে উঁচু করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই লক্ষ্যে বিশেষভাবে আনুকূল্য দেয়া দরকার শিশু সংগঠনগুলোকে। পথ চলাচলে ও যানবাহনে শিশুর নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রতিটি হাসপাতালে শিশুর চিকিৎসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা চাই।

কাজটা কারা করবেন? দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাঁরা ভাবেন তাঁরা করবেন, যাঁরা মানবপ্রেমিক তাঁরা করবেন। রাজনৈতিক দলগুলোরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষ করে সেইসব দলের যাঁরা সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন। সমাজ পরিবর্তিত হবে না, কিংবা হলেও সে পরিবর্তন অত্যন্ত অগভীর হবে যদি শিশুর শৈশবকে রক্ষিত ও বিকশিত করা না-যায়। রাষ্ট্রপ্রধানেরা তাঁদের শীর্ষ সম্মেলন শেষ করেছেন। শেষ করে যে যার দেশে ফেরৎ চলে গেছেন; প্রচার হয়েছে; এবং শিশুর প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আগের তুলনায় কিছুটা বেশি পরিমানে আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু শিশু? শিশুর অবস্থায় তো পরিবর্তন আসেনি। আসবেও না, যদি না ভেতর থেকে অবিরাম চেষ্টা চলে। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে শিশুর জন্য মিত্রে পরিণত করতে পারছি কি পারছি না এর চেয়ে জরুরি প্রশ্ন কমই আছে। আর কী করেই বা অস্বীকার করা যাবে যে, শিশুর প্রতি যে-সমাজ নিষ্ঠুর সে-সমাজ কোনো মানুষের জন্যই মিত্র হতে পারে না, কেননা শিশুকে যে পীড়ন করে সে কেবল নিজের ভবিষ্যতকে যে পীড়ন করে তা নয়, অত্যন্ত অমানবিক নিষ্ঠুরতাও পরিচয় দেয়। তাকে বিশ্বাস করতে নেই। বয়স্কদের ঝগড়া শিশুদের জন্য পীড়ার কারণ হয়; কিন্তু বয়স্করা সবাই মিলে যখন শিশুর বিরুদ্ধে যায় তখন তার চেয়ে বেশি মর্মান্তিক ঘটনা আর কী হতে পারে?

রাষ্ট্রের কাছে শিশু যে কত অসহায় তার খুব পরিচ্ছন্ন ও কৌতুককর প্রমাণ পাওয়া যায় রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে। তখন শিশুর পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বদল দেখা দেয়। যেমনটা ঘটেছিল, ফিলিপাইনের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে। ভাগ্যিস একাত্তরের আগে দালাল ও ঘাতকেরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ইয়াহিয়া খানকে ত্রাণকর্তা হিসাবে চিত্রিত করে ওঠার সময় পায় নি, পেলে আমাদের শিশুদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটা ঘটতো। ফিলিপাইনের পাঠ্যপুস্ত

কে মার্কোসকে মহাপুরুষ বলে পরিচয় দেওয়ার রীতি ছিল। মহোৎসাহে করা হতো ওই কাজ। অকস্মাৎ যখন তিনি পড়ে গেলেন রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে, তখন শিশুদেরকে দেওয়া হলো ভিন্ন খবর। বলা হলো, লোকটা ছিল নিকৃষ্টতম শয়তান।

ব্যাপারটা আমাদের কাছে কৌতুককর, কিন্তু ফিলিপাইনের শিশুদের কাছে নিশ্চয়ই তা ছিল না। শিশুরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। তাদেরকে বিশ্বাস করানো হয়, বড়রা তাদের ধারণাগুলো জোর করে চাপিয়ে দেয় শিশুদের ওপর। কিন্তু গতকাল যা শিখেছে, আজ যদি উল্টোটা শেখানো হয় তবে শিশু যায় কোথায়? কি করেই বা আস্থা রাখে বড়দের ওপর? গতকালের বীরকে আজ যদি দুর্বৃত্ত ভাবতে শেখে, তাহলে কেবল ওই বীরের প্রতিই অবিশ্বাস জন্মায় না, যারা তাকে ভুল শিখিয়েছিল তাদের প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মায় বৈকি। এই কারণে যে, এই শিক্ষকেরা কেবল যে ভুল শিক্ষা দিয়েছিল তা নয়, তারা বোঝেও নি শিক্ষাটা ভুল ছিল, লোকটা আসলেই একজন শয়তান ছিল। এবং দ্বিতীয়, তারা ওই শয়তানকে মেনে নিয়েছে, ধাওয়া দেয় নি, চঞ্চল হয় নি। কিন্তু শিশুরা হয়, যাকে শয়তান বলে জানে তাকে আর কিছু না করতে পারুক অন্ততঃ ঘৃণা করে, আর সে ঘৃণাকে লুকিয়ে রাখে না।

শিশুকে মানুষ করা সহজ, নাকি মানুষকে শিশু করা? জবাবে বলতেই হয় যে, মানুষকে শিশু করা অনেক সহজ, শিশুকে মানুষ করার তুলনায়। ত্যক্ত বিরক্ত অভিভাবকরা হামেশা বলছেন ও-কথা। কিন্ত কথাটা মিথ্যা নয় তাই বলে। রাষ্ট্র বয়স্ক মানুষকে আরেক শিশু বানায়- অসহায়, বোকা, সরল ও বাকহীন ইত্যাদি নানা অর্থে। কিন্তু শিশুকে আমরা প্রকৃত অর্থে মানুষ করতে পারি না। করবো কি? আমরা যারা মানুষ করবো তারাই তো প্রকৃত মানুষ থাকি না সমাজের চাপে, অর্থনীতির কারসাজিতে এবং এদের যে মুখপাত্র সেই রাষ্ট্রের শাসনে।

আমরা কী করছি ওই প্রশ্নটা কোনো মামুলী প্রশ্ন নয়; অতিশয় জরুরী প্রশ্ন বটে। নানা দিক দিয়ে।

লেখক: অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক।

সক্ষমতার শিক্ষা

অধ্যাপক হান্নানা বেগম

নোবেল পুরস্কার জয়ী অর্থনীতিবীদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কোন কিছু দিলেই সেটা দেওয়া হবে না। সেটি গ্রহণ করার মতো ব্যক্তির সামর্থ্য থাকতে হবে।' কঠিন অথচ সহজ কথা। আদি এবং অনন্ত কথা। আমরা অন্তরে ধারণ করার চেষ্টা করছি।

এ বছরের (২০১৩) জুলাই মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘের উন্নয়ন সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) মূল্যায়ন করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে– শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ও ছাত্রীর ভর্তির হার সম পর্যায়ে। মাধ্যমিক স্তরের কাছাকাছি। তবে উচ্চশিক্ষায় ১০০ জন ছাত্রের বিপরীতে শতকরা ৬৬ জন ছাত্রী রয়েছে। মূলত মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্রী উপবৃত্তি এদেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছে। সামনে এগিয়েছে আমাদের নারীরা। একইভাবে আন্ত র্জাতিক অর্থনৈতিক কারণে এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিষ্ঠা নারীকে দু'কলম পড়ালেখা শিখানোর ব্যাপারে সাধারণ জনগণকে আগ্রহী করে তুলেছে। তবে নারী শিক্ষা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, এর পথে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যথেষ্ট। সরকারকে, সচেতন জনগণকে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে। অন্যথায় এই শেষের পথ পার হওয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে- শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো যতো সহজ, তার মান বাড়ানো ততই কঠিন। এ ছাড়া রয়েছে গ্রাম ও শহরের সুবিধাগত পার্থক্য। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী গ্রামে থাকে। দেশে রয়েছে ধনী গরীবের সুবিধাগত ও বন্টনের বৈষম্য। শুধু আর্থিক বৃত্তি দিয়ে, স্কুলে খাবার দিয়ে শিক্ষার শতকরা হার অর্জন বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এটি সামাজিক ও অর্থনীতির আন্তঃসম্পর্কিত গোলাকার চক্র (Vicious Circle)। একটি সম্পর্ক অন্যটিকে টেনে নামায় বা উর্দ্ধমুখী করে। কিছুদিন আগেও পর্যন্ত নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল অভিভাবকদের অনীহা। শিক্ষার প্রতি অনাস্থা। এখন আত্মনির্ভরশীল নারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গরিব অভিভাবকগণ চান, তাঁদের মেয়েরাও কিছুটা পড়ালেখা শিখুক।

২০১৩-১৪ সালের অর্থবাজেটে শিশুবিবাহ রোধে বক্তব্য রয়েছে। বক্তব্যে বলা হয়, "শিশুবিবাহ রোধে আমাদের ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ অনেক জায়গায় নানা উদ্যোগে সহায়তা বা পৃষ্টপোষকতা দিচ্ছেন।" প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, ইউনিসেফের বিশ্বশিশু পরিস্থিতি-২০১১ শীর্ষক প্রতিবেদনে বিশ্বে শিশুবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তিন জন কিশোরীর মধ্যে দু'জনেরই বিয়ে হয়ে যায় তাদের বয়স ১৮ পূর্ণ হওয়ার আগেই। আবার দশ জনের মধ্যে তিন জনের বিয়ে হয় ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩৯ লাখ। কিশোরীদের মধ্যে প্রতি তিন জনে একজন অল্প বয়সেই মা হন। দেশের শতকরা ৯০ জন অভিভাবকই তাদের কন্যাসন্তানকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে চান। অর্থনৈতিক, সামাজিক, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, কু-সংস্কারসহ নানা কারণে মেয়েকে পাত্রস্থ করে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে চান তাঁরা। এতে কম বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর উচ্চহার এবং অপুষ্ট শিশু জন্ম দেয়ার ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে শিশুবিবাহ রোধ করা যাচ্ছে না। এ সংক্রান্ত আইনও খুব দুর্বল। ১৯২৯ সালের শিশুবিবাহ নিরোধ আইনে (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) শিশুবিবাহের শাস্তি হিসেবে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ এমনিতেই জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত। এ অবস্থায় শিশুবিবাহ রোধ করতে না পারলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। এই লক্ষ্যে এ সক্রান্ত আইন যুগোপযোগী ও কঠোর করার পাশাপাশি সামাজিক

সচেতনতাও বাড়াতে হবে। শিশুবিবাহের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনে আরও কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এখন শিশুবিবাহের প্রধান কারণ স্কুলে যাতায়াতের পথে এবং নিজ ঘরে ছাত্রীদের অনিরাপত্তা। আমরা দেখেছি, মেয়েকে স্কুলে নেওয়ার পথে মা জীবন হারিয়েছেন, শিক্ষক জীবন দিয়েছেন। অসংখ্য কিশোরী আত্মহত্যা করছে। শিক্ষামন্ত্রী ছুটে যাচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রাণি বন্ধ করার জন্য হাইকোর্ট নতুন আদেশ জারি করেছে। মনে রাখার বিষয়, আইনের প্রয়োগ অবশ্যই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এই সমস্যা অনেক গভীরে নিহিত, স্থানীয় সরকারের খবরদারির অনুপস্থিতি অন্যতম প্রধান কারণ। ঘরে মায়ের অনুপস্থিতিও একটি কারণ। পাড়ায় খেলার মাঠ নেই। ক্লাব নেই। অতএব, উদ্দেশ্যহারা তরুণদের সহজ বিনোদন মেয়েদের বিরক্ত করা। এ ছাড়া এদেশের হাজার তরুণরা দেখছে যে, নারীকে জনসমক্ষে ফতোয়া দানকারীরা দোররা মারছে। এ দৃশ্য পত্রিকায় ছাপছে, টিভিতে দেখা যাচ্ছে। প্রশাসন দায়সারা গোছের সাড়া দিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো অতি সন্তর্পণে এই অবিচার দেখেও দেখছে না। অবশেষে অভিমানী পথহারা বালিকা আত্মহত্যা করছে। এসব বিষয় তরুণদের আইন অমান্য করার উৎসাহ যোগায়। তারা বিকৃত চিন্তার অধিকারী হয়।

স্কুলগুলোতে পাঠাগারের অভাব রয়েছে। পাঠাগার থাকলেও, লাইব্রেরিয়ান নেই। বর্তমান সরকার প্রাইভেট শিক্ষাদান বন্ধ করার জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এর সাথে শিক্ষকের বেতনের সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি শুরু হওয়া স্কুলভিত্তিক এসেসমেন্ট একটি যথাযথ পদক্ষেপ। স্কুলের একাডেমিক সুপারভিশন আরও জোরদার করা দরকার। বেসরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থাপনার কমিটি শক্তিশালী করে কমিউনিটি মোবিলাইজ করতে হবে। এস.এম.সি'র প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এসব কমিটিতে জাতীয় সংসদ সদস্য, আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব বন্ধ করা প্রয়োজন। কমিটির সদস্যগণ হবেন- অভিভাবক এবং সমাজের নির্দিষ্ট বিষয়ে অবদান রাখার মতো পরিচিত ও যোগ্য ব্যক্তিত্ব। স্কুলের পারফরমেন্স ও অনুদানের মধ্যের সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। সর্বপরি আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বক্তৃতা পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ক্লাসে শিক্ষক সঞ্চালনকারী প্রাণ পুরুষ। যিনি ক্লাসকে প্রাণ দেবেন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবেন। ছাত্রদের মেধার প্রতি শিক্ষকদের সম্মানবোধ থাকা প্রয়োজন।

আমাদের শিশুরা, তরুণরা কি পড়ছে, সেটিও আমাদের দেখা দরকার। শিক্ষার মূলাধার হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম। এ কারিকুলামের নির্যাসে তৈরি হয় পাঠ্যপুস্তক। আর এই পাঠ্যপুস্তক আগামী জাতি গঠনের মনোবিকাশপত্র। পাঠ্যপুস্তকের নির্যাস আদলে শিশু আপন অজান্তে নিজেকে গড়ে তোলে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। এসব অন্তর্নিহিত কারণে কারিকুলামবিদ, সিলেবাস প্রণয়নকারী, লেখক, গ্রন্থ পরীক্ষক এবং সর্বপরি শিক্ষক এঁদের জেন্ডার সমতা সম্পর্কে এবং গতিময় বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁদের এ বহুমুখী জ্ঞানের বিশেষত জেন্ডার সমতা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষনের জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই। ফলত নারী শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য এবং টেকসই উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা এখনও প্রতি পদে অবহেলিত হচ্ছে, যার প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়নকারী সংস্থা হচ্ছে ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড। এই সংস্থার একজন সাবেক সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে এই বিষয়গুলো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। সে সময় বরাদ্দ না থাকা সত্বেও আমি কারিকুলাম প্রণয়নকারী, লেখক, পুস্তক পরীবিক্ষণকারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চেষ্টা করেছি। কারিকুলাম পরিবর্তন সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ বিষয়। এসব সংস্থার কর্তা ব্যক্তিগণের দীর্ঘকালীন সময় একই পদে অবস্থান করার সুযোগ কম হয়। ফলত কর্মকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু সংস্থা, দেশ বা ছাত্রসমাজ পায় না। এ সংস্থার মধ্য স্তরের কর্মকর্তাগণ মাঝেমধ্যে কারিকুলাম বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুযোগ

পান। কিন্তু পদোন্নতির পর তাদের বদলি করা হয়। আবার নতুন কর্মকর্তা বহাল হন। নতুন যিনি আসেন তাঁর পক্ষে হঠাৎ করে কারিকুলামবিদ হয়ে ওঠা কঠিন হয়। অতএব, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থেই অর্থবহ করতে হলে উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি আমাদের মনোনিবেশের প্রয়োজন রয়েছে।

লেখক: অধ্যাপক হান্নানা বেগম, পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সাবেক অধ্যক্ষ, ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।

নিয়মের ঘেরাটোপে নারীঃ অধিকারের আন্দোলন যেন রুটিন ওয়ার্ক

আইরীন নিয়াজী মান্না

১.

চার দেয়ালের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশের নারী সমাজ। পুরুষের সঙ্গে সমান তাল মিলিয়ে সবক্ষেত্রেই তারা রাখছেন অসামান্য অবদান। ঘরকন্যা, সন্তান লালন-পালন থেকে শুরু করে দেশ, রাজনীতি, সংস্কৃতি-কোথায় নেই তাদের উজ্জ্বল বিচরণ। সৃজনশীলতা, সৃষ্টি, উৎপাদন-কর্মক্ষেত্রের সব জায়গাতেই নারীর জয়জয়কার। বিপদসংকূল পথ ও নিয়মের ঘেরাটোপ দমাতে পারছে না নারীকে। নারী আন্দোলনের বিস্তারও ঘটেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। অধিকার নিয়ে সোচ্চারও নারীরা। কিন্তু ফল মিলছে না কিছুতেই। নিয়মের সেই ঘেরাটোপে আটকে যাচ্ছে বারবার। নিপীড়ন বন্ধ তো দূরেই থাক, উল্টো আশংকাজনক হারে বেড়েই চলছে নারীর প্রতি সমাজ, রাষ্ট্র আর ব্যক্তির সহিংসতা। এখনো নারী কখনো স্বামী, বন্ধু, কর্মক্ষেত্রের কর্তা কিংবা সহকর্মী, কখনো বা বহুদিনের চেনা স্বজনদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে নানাভাবে, নানা রকমে।

১৯০৮ সালে প্রথম সংগঠিত হয়ে সোচ্চার কণ্ঠে নারী শ্লোগান তুলেছিল- নারীর প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হোক, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোক সবাই। কিন্তু তা হয়নি। নারীর জীবন থেকে দূর হয়নি বৈষম্য। আজও নিশ্চিত হয়নি জীবনের কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা। মেলে নি কাজের, মানবিক অধিকার, ইচ্ছা-অনিচ্ছার পুরো স্বীকৃতি।

২.

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সাথে এদেশীয় নারী আন্দোলনের সম্পৃক্ততা গত দু'এক দশকের মধ্যে ঘটে নি। যদিও দিবস হিসেবে গত দু'দশক ধরে আন্তর্জাতিক নারীবাদ/নারীমুক্তি ও নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে নারী সংগঠনগুলো। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেগম রোকেয়ার লেখনীতে আমরা একক নারী আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রয়োজন সম্পর্কে আভাস পাই। রোকেয়া সমাজে ও পরিবারের নারীর অধস্তন অবস্থানকে তার লেখনীর মাধ্যমে বারবার সামনে হাজির করেন। তিনি নারীর এই অধস্তন অবস্থানের পেছনের কারণগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর তীব্র প্রতিবাদ করে গেছেন তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে। শিক্ষা গ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত–সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল নামে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই তার লেখা বাংলার নারীদের প্রেরণা জুগিয়েছে এবং এখনও তার লেখা আমাদের জন্য ভীষণভাবে সমকালীন। নারীর

সম-অধিকার লাভের ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা, পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, শিশুবিবাহ ও শিক্ষার অভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জ তিনি ছুড়ে দিয়েছিলেন, এখনও সেই সমস্যাগুলো আমাদের সমাজ থেকে অপসারিত হয়নি।

৩.

নারীরা বিশেষত কর্মজীবী নারীরা আগের তুলনায় অনেক সুযোগ-সুবিধা পেলেও (যেমন- মাতৃকালীন ছুটি, শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র) সামগ্রিকভাবে সম-অধিকার লাভের ক্ষেত্রে অর্জনের বিষয়টা এখনও বেশ হতাশাব্যঞ্জক। এ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে এখনও অনেকাংশেই পিছিয়ে আছে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, পুরুষতান্ত্রিকতা নারীর অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এখনও এ দেশের অধিকাংশ পুরুষ (অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও) পারিবারিক নির্যাতনকে স্বামী ও স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করেন। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, এ দেশে ৬৭% নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার। ধর্ষণ, যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটে চলাফেরার ক্ষেত্রে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। যৌন হয়রানি এবং স্কুল-কলেজে যাওয়ার সময় উত্ত্যক্ত হওয়া নিত্যদিনের ব্যাপার। এসব কারণে অনেক মেয়ে নীরব প্রতিবাদস্বরূপ আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছে।

নারীর কর্মক্ষেত্র যত প্রশস্ত হচ্ছে, নারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রাটাও যেন ততই বাড়ছে। ঘরে বাইরে অব্যাহত রয়েছে নারী নির্যাতন। ইউনিসেফ বলছে, গত বিশ বছরে বাংলাদেশ থেকে দুই লাখ নারী ও শিশুকে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এখনো প্রতি মাসে পাকিস্তান, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হচ্ছে ৪শ' নারী ও শিশু। এদের ৬০ ভাগেরও বেশি কিশোরী। 'কোস্টাল নেটওয়ার্ক ও সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ' নামক সংস্থা বলছে, দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের ৬৮ দশমিক ৬ শতাংশই শিশুবিবাহের শিকার হচ্ছে।

দেশে গত এক দশকে কেবল বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে ৬৭ নারীকে। একই কারণে প্রস্তাবকারীদের অব্যাহত হুমকি ও ভয়ের মুখে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন ৯ নারী। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন যে সব নারীরা তাদের ৮৯ শতাংশকেই এসিডে ঝলসে দেওয়া হয়েছে কেবল বিয়ের প্রস্ত াব প্রত্যাখ্যান করায়। সমান কাজ করেও মজুরি বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে নারীকে। সরল গড়ের ভিত্তিতে দেখা গেছে, নারীরা পুরুষের চেয়ে ২১ শতাংশ কম মজুরি পাচ্ছেন। এমনকি স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে নারীকে।

এখনো দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র হতাশাজনক। এই হার আওয়ামী লীগে ১১ শতাংশ, জাসদ ১০ শতাংশ, বিএনপি ৬ শতাংশ, জাতীয় পার্টি ৩ শতাংশ, জামায়াত শুন্য শতাংশ। সরকারেও নেই আশাব্যাঞ্জক উপস্থিতি। স্বাধীন দেশের প্রথমবার শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের সময় (১৯৭২-৭৫) ৫০ সদস্যের মন্ত্রী সভায় নারী সদস্য ছিলো মাত্র ২ জন, জিয়াউর রহমান সরকারের সময় (১৯৭৯-৮২) ১০১ সদস্যের মন্ত্রী সভায় নারী ছিলো ৬ জন, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সময় (১৯৮২-৯০) ১৩৩ জনের মধ্যে নারী ৩জন, শেখ হাসিনার সময় (১৯৯৬-২০০০) ৪৬ জনের মধ্যে নারী ৪ জন, বেগম খালেদা জিয়ার সময় (২০০১-২০০৬) ৬০ জনের মধ্যে নারী মন্ত্রী ছিলেন মাত্র ৩ জন এবং বর্তমান মহাজোট সরকারের ৩১ জন মন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে নারীর সংখ্যা মোট ৫ জন।

৪.

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ঘোষিত নারীর জন্য সব বৈষম্য দূরীকরণের সনদে (সিডও সনদ) স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। এই সনদটির ধারাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনকে সম-অধিকারের ভিত্তিতে প্রণয়ন করার জন্য নারী সংগঠনগুলো বিশেষভাবে সক্রিয়। ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের ৩০টি ধারার মধ্যে ২, ১৩ (ক), ১৬র ১গ ও চ বিষয়ে সম্মতি সংরক্ষণ রেখে স্বাক্ষর করেছে। ১৯৯৭ সালে ১৩(ক)

(পারিবারিক কল্যাণের অধিকার) এবং ১৬চ (অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব,ট্রাস্টিশিপ ও সব ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)-এই ধারা দু'টির প্রতি সংরক্ষণ সরকার তুলে নিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত সরকার ২ ধারা (মূলত এই ধারাটি গুরুত্বপূর্ণ, যে সনদে উল্লিখিত ধারাগুলোর বাস্তবায়নে সরকার নিজ দেশে আইন করবে) এবং ১৬.১.গ ধারা (বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব) বাংলাদেশ সরকার সংরক্ষণ করে রেখেছে। বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো যারা এই সনদ অনুমোদন করেছে তাদের প্রতিনিয়ত নিজস্ব দেশের নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে জাতিসংঘে পাঠাতে হয়। প্রতিবারই প্রতিবেদন পাঠানোর সময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় সংরক্ষিত ধারাগুলো বিবেচনাধীন রয়েছে।

সরকার 'পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ও শরিয়া আইনের পরিপন্থী' উল্লেখ করে ১৬.১.গ ধারার প্রতি সম্মতি দিচ্ছে না। ২ ধারার প্রতি সম্মতি দিচ্ছে না ১৬.১.গ বিষয়ে ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে আইন করার প্রতি সরকার এখনো সম্মত নয় বলে। যেমন- ধর্মনিরপেক্ষভাবে দেশের সব নারীর জন্য পারিবারিক আইনে নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান হোক, বিয়ে রেজিস্ট্রি ও তালাক দেয়ার অধিকার হিন্দু নারীর জন্য আইনসম্মত করা হোক; উত্তরাধিকারে ধর্ম নির্বিশেষে সব নারীর জন্য নারী-পুরুষের অধিকার সমান করে আইন হোক-এসব বিষয়ে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'তেও বিভিন্ন সময় দেশের সরকারগুলো দ্বিমত পোষণ করেছে। এমনই যদি হয় তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা কোথায়? সিডও সনদের কয়েকটি ধারার বিষয়ে এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির নানা বিষয়ে সরকার ধর্মীয়ভাবে বাধা বলে মূলত নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখছে।

মুসলিম দেশ বলে আখ্যায়িত দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ২৯-এর ১ ধারা সংরক্ষিত রেখেছে তাদের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে। মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ সরকারই কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই সিডও সনদে স্বাক্ষর দিয়েছে। তারা নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপের জন্য সিডও সনদের ধারাগুলোতে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিচ্ছে এবং সম্মিলিতভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যবোধের অসাম্য, অবক্ষয়, নির্যাতন বন্ধের পদক্ষেপ নিচ্ছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তিউনিশিয়া, তুরস্ক, মালয়েশিয়ার নারীসমাজ ও সরকার শরিয়ার বিধান বিষয়ে কাজ করে প্রমাণ করেছে, মানুষে মানুষে বিভেদ শরিয়ার বিধান কেন কোনো ধর্মীয় বিধানেই অনুমোদিত নেই। নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যও ধর্মীয় বিধানে নেই। মূলত ধর্মীয় বাধা নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও রক্ষণশীলতাই নারীর প্রতি বৈষম্য বজায় রাখছে।

৫.

এতো বাধা ও প্রতিবন্ধকতার পরও বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রা সাধিত হয় নি এ কথাটিও বলা যাবে না। এ অঞ্চলের নারীরা ভোটাধিকার পায় ভারত বিভাগের পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ১৯৩৫ সালে। তাই ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নারীরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ভোট দেয়ার অধিকার লাভ করেন। তবে তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কিছু খণ্ডচিত্র আমরা দেখতে পাই এবং এক্ষেত্রে বাঙালি নারীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে কয়েকজন নারী সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। নারীরা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন দাবি আদায়েও তারা সবসময় সোচ্চার ছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অনেক নারী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও আজও মেলেনি তাদের স্বীকৃতি। গত দুই দশকে আমরা দু'জন নারী প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছি এবং এই বর্তমান সরকারের বেশ কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভারও গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সংসদ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন একজন নারী স্পিকার।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কিছু পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে তার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা কিছু পরিবর্তন দেখতে পাই। নারী শিক্ষা আগের তুলনায় বেড়েছে, ব্যাপকসংখ্যক নারী পোশাক কারখানায় কাজ করছে

পুরুষের পাশাপাশি। পোশাকশিল্পে প্রায় ৮৫ শতাংশই নারী শ্রমিক। নারীরা আজ পুনরুৎপাদন অধিকার নিয়েও কথা বলছে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূর করার জন্য বিশেষ আইন ও আদালত গঠিত হয়েছে। কিন্তু তার পরও পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্তায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীকে লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে। পুরুষশাষিত দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে বারবার। নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারছে না। নারী আন্দোলনের প্রক্রিয়াটি কেমন যেন ঝিমিয়ে পরেছে, অনেকটাই পরিণত হয়েছে রুটিন ওয়ার্কে।

৬.

অথচ আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে ষাটের দশক থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরে আশির দশকের সময়টাকে নারী আন্দোলনের একটি প্রশংসনীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে। সেই সময় বাম ও সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর নারী শাখায় যে নারীরা কর্মী এবং নেতৃস্থানীয় অবস্থানে ছিলেন তারা নারী বিষয়ক ইস্যুগুলোতে সমাজকে সচেতন করেছেন। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে হস্তশিল্প, সেলাই প্রশিক্ষণ অন্যতম। নারীর সম-অধিকার সংক্রান্ত দাবি দাওয়া (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন) নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সূচনা তারাই প্রথম করেছিলেন। আশির দশকে বাম রাজনৈতিক দল এবং মূলধারার রাজনীতির নারী শাখার বাইরেও নারী মুক্তি আন্দোলনের আরেকটি স্বাধীন, ক্ষীণ অথচ সাহসী ধারা পরিলক্ষিত হয়। নারীর সার্বিক মুক্তি সাধনের জন্য নারীর একটি পৃথক লড়াইয়ের জায়গার প্রয়োজন আছে- তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে সেই জিনিসটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এর উদাহরণস্বরূপ আমরা পাই নারীর পুনরুৎপাদন/প্রজনন অধিকার সংক্রান্ত ধারণাকে রাজনৈতিকভাবে উত্থাপন করা এবং অনেকাংশে সমাজকে বোঝানো যে সন্তান ধারণে নারীর সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য হবে। সে সময়টায় নারী সংগঠনগুলো কোনোরূপ বিদেশি সাহায্য ছাড়াই মৌলবাদ, ফতোয়া ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে স্বেচ্ছাসেবী নারী মুক্তি আন্দোলনের সেই ধারাটি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আজকাল নারী আন্দোলনে এনজিওর কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় হলেও দাতা সংস্থা অথবা বিদেশি সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ স্বাধীন নারী আন্দোলন গড়ে না ওঠার শূন্যতা অনুভব করা যাচ্ছে। দাতা সংস্থাদের সাহায্যে পরিচালিত নারী বিষয়ক কর্মকাণ্ড প্রকল্পভিত্তিক ও প্রকল্পকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার তাগিদ থাকে। একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন বা ফলাফল আশা করা হয় তা বয়ে আনাও সম্ভব না। তাছাড়া একটি দেশের নারী আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠা কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না। আর তা বৃহত্তর নারী সমাজের জন্য স্থায়ী সুফল বয়ে আনতেও পারে না।

লেখক: আইরীন নিয়াজী মান্না- সম্পাদক–উইমেননিউজ২৪.কম ও নারী বিষয়ক সম্পাদক-ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।

অরক্ষিত পাখিরা

ওয়াহিদা বানু স্বপ্না

মায়ের ডাক শুনতে পায়- দূর থেকে।

: পাখি-- পাখি-- ও পাখি-- পাখি।

কই যে গেল মাইয়াডা, সারাক্ষণ অস্থির পাখির মতোন এপাড়া ও পাড়া ঘুইরা বেড়ায়।

এই রকম প্রতিদিনই কিছু না কিছু ব্যঞ্জনা যুক্ত হয় মায়ের ডাকের সাথে। কখনো মন কেমন জানি করে, কান্না পায়, আবার কখোন সব কিছু সামলে নিয়ে মায়ের সামনে জড়োসড়ো পাখি উপস্থিত হয়। অবোধ অবুঝ শান্ত যেন এ বালিকা। পাখির উপস্থিতি দেখে মা বলে-

: কই যাস? আজ বাড়িতে মেহমান। কত কাজ-কাম। দুটো হাত নাড়া দিলেও তো আমার কত উপকার হইতো। খালি বাইরে বাইরে ঘুরোস ক্যান ?

: মা কিছু করইতে হইবো ? ও মা !

: তোর জামিলা খালার ঘরে যাইয়া দুইডা হাড়ি নিয়া আয় দেহি। যাইয়া কইবি, আমাগো বাড়িতে মেহমান। মায়ে দুইডা হাড়ি চায়। আন্ধার হওনের আগেই দিয়া যামু।

পাখি, চঞ্চল পাখির মতোই দৌড়াতে দৌড়াতে দিঘীর পাড় ঘেষে বাশবন পাড় হয়ে ছোট হাঁটা পথ বেয়ে গুন গুন করে, আর লাফাতে লাফাতে ডাকতে থাকে,

: জামিলা খালা? ও জামিলা খালা!

: ও মা পাখি যে! পাখি আইসোস, কিরে মা, ভালা আছিস। তোর মায়ে ভাল আছে। তোর দাদী ? একবারে এতো প্রশ্নের উত্তোর দিতে পারবে না। তবে সব প্রশ্নের উত্তরই জানা আছে পাখির ।

: জামিলা খালা, আগে আসল কথা কই, আমাগো বাড়িতে মেহমান আইসে। তাই মায়ে আমারে কইলো, তোর জামিলা খালার ঘর থাইকা দুইডা হাড়ি নিয়া আয়। সন্ধ্যার আগেই দিয়া আসবি।

: ও এই কথা। আচ্ছা ঘরের ভিতরে আয়। টংয়ের উপর উইঠা দুইডা হাড়ি পাইড়া নে। সাবধানে ! নাইলে হাড়ি ভাঙ্গবো।

পাখি লাফ দিয়ে টংয়ের উপর উঠে। হাড়ি পাড়তে পাড়তে জামিলা খালার সব কথার উত্তর দিতে থাকে। মায়ে তো ভালই আছে। ক্ষেইপা গেলেই আমারে দুই চাইরডা বসায় দেয়। আর দাদি কি করবো। ঐ ঘরে সারাদিন হুইয়া থাকে। উঠতেও তো পারে না। কেউ যদি বাড়িতে না থাকে তখন ছ্যাঁছড়াতে ছ্যাঁছড়াতে ঘরের বারান্দায় আহে। মায়ে তহন আরও রাগ করে। দাদি কিছু কয়না, চুপ কইরা থাহে। কি কইবো, অসুস্থ মানুষ তাতে আবার বুড়ি মানুষ। কেউ তো তার কথা শুনে না।

পাখি দুই হাতে দুটো হাড়ি দুই গলা জড়িয়ে ধরে কোমরের দুই পাশে নেয়। নিজেকে সামলে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবার সময় বলে-

: আচ্চা খালা। আহি।

: যা সাবধানে যা। লাফাইবিনা। সাবধানে যাবি, নইলে সব হাড়ি ভাইঙ্গা যাইবো।

দুই হাতে দুটো হাড়ি। বেশ ভারি ঠেকে। এরমাঝে পাখি এক সময় পুকুর পাড়ে বসে আরাম করে নেয়। আবার হাটে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বাড়িতে উপস্থিত হয়। হাড়ি পেয়ে মায়ের মনটা আজ খুব ভাল। পাখির মন ভাল না খারাপ তার উপর এ বাড়ির কিছুই নির্ভর করে না। মায়ের মন খারাপ হলে সবার মন খারাপ। দাদির, পাখির, পাখির ছোট দুই বোনের, ছোট ভাই টারও। পাখির বাবার কি? সেতো কাজের খোঁজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। কখন পনের দিন, কখনও এক মাস, কখনও তিন মাস পর ফেরত আসে। গ্রামের সবাই পাখির বাবাকে আক্ষু মিয়া নামে ডাকে। আবু মিয়া মাঝে মধ্যে গ্রামেও কামলা খাটে।

: পাখি.....পাখি ও পাখি? মা . . . আবার ডাকে

: কি মা। ডাকছো ? হাফাতে হাফাতে বলে।

: পোলাপান গো বাইরে নিয়ে যা। এহন মেহমানদের খাওয়াইয়া বিদায় দিমু।

: মা আমারও ক্ষিদা লাগছে। কহন খাওন দিবা ?

: যা কইলাম তা-ই কর। তুমি কি আমার ঘরের মেহমান হইছো? তোমারে আগে খাওন দিমু?

পাখি ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। গাছের নিচে বসে ক্ষুধা ভুলে ভাই-বোনদেরকে নিয়ে খেলতে থাকে। অপেক্ষায় কান খাড়া করে থাকে কখন মা তাকে খেতে ডাকবো। মাঝে মাঝেই মনটা উদাস হয়ে যায়। পাখি যখন ছয় কী সাত বছর বয়সের তখন তার মা এ পৃথিবী থেকে চলে যায়। লোকমুখে জানতে পারে যে, চিকিৎসার অভাবে তার মা মারা যায়। এই কিছুদিন আগে পাখির তখন দু'টা দুধের দাত পড়ল, পাখি দাঁত দু'টো হাফপ্যান্টে গুঁজে রাখল। জানে না কি করবে। দাদিকে জিজ্ঞেস করলো- পড়ে যাওয়া দাঁত দুটো দিয়ে সে কি করবে? কোথায় রাখবে? নাকি দাঁতগুলো আবার জোড়া লাগানো যাবে? দাদি বললো-

: তোর দাঁত দুইডা ইঁদুররে খাইতে দে। তাইলে ইঁদুর তার দুইডা দাঁত তোরে দিয়া যাইবো।

: নাহ! আমি কখনো আমার দাঁত ইঁদুররে খাইতে দিমু না। কখনো না।

পাখি তার দাঁত কিছুতেই ইঁদুরকে খেতে দেবে না। পাখি চুপচুপ করে সবার অগোচরে মায়ের কবরের কাছে গেল। কয়েকটা ছোট বাশেঁর কঞ্চি দিয়ে মায়ের কবরের পায়ের দিকের মাটি খুঁড়তে থাকলো। আস্তে... আস্তে .....। তারপর মায়ের পায়ের মাটির নীচে তার দাঁত দু'টো রেখে মাটি চাপা দিতে দিতে আনমনে বলতে থাকে ---
--

: মা, অ মা, মা- আমার দাঁত দুইডা আমি তোমার কাছে রাইখা গেলাম। তুমি যখন আমার দাঁত জোড়া লাগায় দিবা তখন সবাই দেখবে আমার আবার দাঁত হইছে। পাখি আস্তে আস্তে মাটি চাপা দেয় এবং আলতো করে মায়ের কবরের ওপর হাত বুলায়।

: মা তোমারে ব্যাথা দিলাম। মা! তুমি ঘুমাও। আমি কি তোমারে ব্যাথা দিবার পারি। তুমি তো আমারে কোন দিনও ব্যাথা দেও নাই, একটা চড়ও দেও নাই, একটা গালিও না। একদিনও আমারে ক্ষিদা লাগতেও দেও নাই। ক্ষিদা লাগার আগেই খাওন দিছো! আর কইতা, আমার পাখি! ময়না পাখি! পেট ভরে খাও। আল্লায় তোমারে অনেক বড় করুক। অনেক দিন বাঁচায় রাখুক! মা তখন তোমার কোন কথাই বুঝি নাই। তুমি এতো কথা ক্যান কইতা! তাও বুঝি নাই। এখন বুঝি তুমি মইরা যাইবা বইলাই এত কথা কইতা।

: পাখি পাখি--- পাখি----। মায়ে ডাকে। পাখি ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে দৌড়ে বাড়ির ভিতরে আসে। মায়েরে জিগায়-

: মা মেহমান চইলা গেছে। আমি অহন খামু? খুব ক্ষিদা লাগছে----------

পাখির মা তার ছেলে-মেয়েদের কোলে নেয়, কারও হাত ধরে নিজের ঘরে যায় বিছানায় বসে আরাম করার জন্য। ঘর থেকে পাখিকে বলে-

: পাখি যা হাঁড়িতে খাবার আছে। খাইয়া ল। আর থালিতে ভাত ক'ডা তোর দাদির মাথার কাছে দিয়া আয়। আর শোন! খাওন শেষ হইলে হাঁড়ি দুইডা নিয়া পুকুরে ভালো কইরা ধুইয়া তোর জামিলা খালার বাড়িতে দিয়া আবি।

পাখি খাওয়া শেষে দাদির কাছে যায়।

: দাদি ও দাদি খাইবা?। খাওনা দাদি। তোমার ক্ষিদা লাগে না? আমার ক্যান এতো ক্ষিদা লাগে? আমি যদি তোমার মতোন হইতে পারতাম, তাহলে রোজ রোজ মায়ের গালমন্দ শুনতে হইতো না।

পাড়ার মানুষ কয়, সৎ মায় কোনদিন ভাল হয়না।

দাদি পঙ্গু। অসাড় দেহে পড়ে থাকে। আর ফ্যাল ফ্যাল করে পাখির দিকে তাকায়। সমস্ত পৃথিবীর আদর তার চোখের তারায় স্বচ্ছ মুক্তা হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে। পাখি দাদির চোখ মোছে আর বলে- দাদি খালি খালি কথায় কথায় তোমার চোহে কোত্থেকে পানি আসে? সারাক্ষণ কাঁন্দন কাঁন্দন।

: তুমি খাইয়া লও। আমি জামিলা খালার বাসায় হাঁড়ি দিতে যামু।

পাখি দু হাতে হাঁড়ি নিয়ে পুকুর পাড়ে যায়। হাঁড়ি ধুতে ধুতে নিজের শরীরটাও পানির স্পর্শে জুড়িয়ে নিতে চায়। সারাদিন রোদ গরমের দাবদাহ শরীর পোড়ায় কিন্তু মন পোড়ায় না। পাখি হাড়ি দুইটা রেখে পুকুরের পানিতে নামে। পানিতে ডুব দেয় আবার উঠে। আবার ডুব। আবার উঠে। ভেজা শরীরে পুকুর থেকে উঠে আসে। হাঁড়ি

দুইটা হাতে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে উঠতে পা পিছলে পড়ে যায়। সমস্ত শরীর কাঁদামাটি মাখা হয়ে যায়। হাঁড়ি দুইটা যে কখন ভেঙ্গে যায় তা সে নিজেই ঠাহর করতে পারে না। নিজের শরীরের কাদা-মাটি পরিস্কার করতে আবার পানিতে গিয়ে ডুব দেয়। পাড়ে উঠে দেখে হাড়িই দুইটা ভাঙ্গা। ওর তখন স্মরণ হয় পা পিছলে পড়ার সময় হাড়ি দুটো ভেঙ্গে গেছে। মাটির হাঁড়ি ভাঙ্গবে নাতো কি! কিন্তু মনের ভিতরে ভয়ে ভয়ে সমস্ত শরীরের রক্তে থেকে থেকে বিদ্যুত খেলে যায়, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। বাড়িতে খালি হাতে ফেরত আসে পাখি। ঘরের দরজা দাঁড়িয়ে ডাকে-

:মা! মা! ও মা--

:কি হইছে। হাড়ি দিয়া আইছস? কিরে কথা কইস না কেন? পাখি? ও পাখি?

মা ঘরের বাইরে এসে পাখির অন্যরকম এক উপস্থিতি দেখে। ঐ কি হইছে? হাড়ি দিয়া আইছস নাহ। না-কি? কথা কসনা ক্যান?

: নাহ! না মা। পুকুরে হাড়ি ধুয়ে আমি গোসল করে নিয়া উঠবার সময় পা পিছলাই পইড়া গ্যাছিলাম। তহন দেহি হাড়ি দুইডাই ভাইঙ্গা গেছে।

মাথা নিচু করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাখি। দুইটা মাটির হাড়ি ভেঙ্গেছে, এটা অপরাধ নাকি অপরাধ নয়, এ বিষয়টি বোঝার আগেই মায়ের রাক্ষুসে মূর্তি দেখতে পায় সে। চুলের ঝুঁটি ধরে মা বেদম পেটাতে থাকে পাখিকে। আর চিৎকার করে করে বলে----------

; হায়রে দুই দুইডা হাড়ি ভাঙ্গলো! অন্য মানুষের হাড়ি আমি কই থেইকা আইনা দিমু! তোরে আমি পুকুরে গোসলে পাঠাইছি? নাকি হাড়ি ধুইতে। অলক্ষী মাইয়া। নিজের মায়েরে খাইছস। তুই আমারেও খাবি। দূর হ বাড়ি থেইকা। আমার চোহের সামনে আর কখনো আবি না তুই। যদি আইছোস তয় আমার মরা মুখ দেখবি।

দু'চারজন পড়শি মহিলা জড়ো হয়। কি আর বলার আছে। কেউ বলছে, দুইডা হাড়ি ভাঙ্গছোস, তয় রাগ তো হইবোই। কেউ বলছে- সৎ মায়ের মন পাষাণ হয়। তয় এতো পাষাণ দেহি নাই।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। পাখির খবর কে নেয়। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে কাশিনাথপুরে লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে যায়। এখানে ছোট ছোট লঞ্চ ঘাটে লাগে দিনে তিন কী চারটা। কাশিনাথপুরের লঞ্চ ঘাটে আগেও একবার এসেছে পাখি তার বাবার সাথে। কিন্তু লঞ্চে কখনো ওঠেনি। অনেক লোকের ভীড়ে সেও লঞ্চে উঠে চেপে বসে। একটা পরিবার বেশ ক'য়েকজন একসাথে বসেছে। পাখি ঐ পরিবারের কেউ, অনেকেই এমন মনে করতে থাকে। সারা রাত কেটে যায়। সকালে লঞ্চ ঘাটে বাঁধা। পাখি জানে না কখন সবাই নেমে গেছে।

: এই মাইয়া কই যাইবা? নামবা? নাকি লঞ্চেই থাকবা?

পাখি চোখ খুলে উঠে বসে। ঘুরে তাকায়। আধা বয়স্ক লোক। বাবার মতোন। তারদিকে চেয়ে জানতে চায়-

: কই আইসি আমি, এটা কোন জায়গা? এই জায়গার নাম কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

লঞ্চের লোকটি বুঝতে পারে মেয়েটির সাথে কেউ নেই। মেয়েটি একা এবং জানেও না যে, সে কোথায় যাবে। নিশ্চয়ই কোন কারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।

: লহ, ওঠ, আমার সাথে যাবি? আমি তোরে একখানে দিয়া আসি।

: কোথায় ?

: আরে চল! বালা থাকবি। বালা খাবি। লেহাপড়া শিখবি। যাইবি? চল। লোকটি পাখির হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। পাখিও শান্ত লক্ষ্মী মেয়ের মতো লোকটির সাথে পায়ে পায়ে হেটে চলে।

বাবার আদলের এক অশুভ ছায়ায় পাখির সমস্ত চঞ্চলতা মুহূর্তেই থেমে যায়। দীর্ঘদিন পাখির আকাশ মেঘলা থাকে। কখনো ঝড় ওঠে, কখনো তুফান ওঠে, কখনো প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। পাখি অনেক দিন নীল আকাশ দেখতে পায় না। অনেক দিন সূর্য ওঠা দেখতে পায় না। অনেক দিন দেখতে পায় না কি করে সকালের রোদ্দুর গাছের সবুজ কচি পাতায় চিক্ চিক্ করে নাচে। পাখির আশেপাশে কোন ঘাস ফড়িং আসে না। কোন প্রজাপতি আসে না। কোন পাখির ডাক শুনতে পায় না, কোন ফুলের সুগন্ধ তার কাছে পৌঁছায় না।

তার সমস্ত শরীর অপরিস্কার এবং দুর্গন্ধময় মনে হয়, তার চারিদিকের বাতাসও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে মনে হতে থাকে। যেখানে বড় বড় বন্য মাছিরা ভন্ ভন্ করে। উড়ে এসে বসে। আবর্জনার স্তুপ থেকে নোংরা ও পঁচা খাবারগুলো তৃপ্তি সহকারে চুষতে থাকে। যখন পাখি চেতনা ফিরে পেলো, মনে হলো যেন দীর্ঘ দিনযাবৎ সে ঘুমিয়ে ছিলো। বিকট কোলাহলে যেন তার ঘুম ভাঙ্গলো। সদরঘাট। অনেক শব্দ, অনেক কথা শুনতে পায়। সবকিছুই পাখির কাছে অসহ্য লাগে।

তারপর প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর কেটে গেল পাখির ঢাকা শহরে। অমর্যাদা আর অবহেলা সব কষ্ট যন্ত্রণা মাথায় নিয়েও নিজের পায়ে দাঁড়াবার স্বপ্নে বিভোর পাখি। কিছুটা লেখাপড়া শিখে ট্রেনিং নিয়ে আজ পাখি প্লাস্টিক ওয়ার্কশপের একজন কর্মচারি। কয়েকজন মেয়ে কর্মচারি মিলে একটা ছোট বাসা ভাড়া নিয়ে ওরা একসাথে বসবাস করে। আনন্দ-বেদনায় বেড়ে ওঠে। সবাই সবার মনের কথা, কষ্ট আর নিজের পায়ে দাঁড়াবার স্বপ্নের কথা বিনিময় করে। পাখি ভালো কর্মচারি। বেশ ক'টা টাকাও জমেছে। জীবনের প্রথম বেতন পাবার পর মায়ের জন্য একজোড়া এলুমিনিয়ামের পাতিল কিনে রাখে। আবার কিনে পাতিল, জগ, মগ, প্লেট। পাখির এখন অনেক জিনিস জমে গেছে। খুবই ইচ্ছে হয় বাড়িতে ফিরে যাবার। পাখি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের আয়ের টাকায় কত্তোকিছু কিনতে পারে। এখন মনে পড়ে তার দাদি একবার রসোগোল্লা খেতে চেয়েছিল। বাবা-মা কেউই তাকে একটা রসোগোল্লা এনে খাওয়াতে পারেনি। বাবার মাত্র দুইটা লুঙ্গি। ছোট ভাই-বোনগুলো না জানি এতোদিনে কতো বড় হলো!

পাখি সিদ্ধান্ত নিলো এবার ঈদের আগেই বাড়িতে যাবে। ঈদের জন্য খরচ করে মায়ের শাড়ি, ভাই- বোনের জন্য আলাদা করে ফ্রক, গেঞ্জি, বাবার লুঙ্গি। দাদির জন্য এক কেজি রসোগোল্লাও। রাতের লঞ্চে উঠে ভোরে পৌঁছে যায় কাশিনাথপুর ঘাটে। আবার রিক্সায় করে বাড়ির দিকে রওনা হয়। পাখির মনটা ভীষণ অস্থির আর চঞ্চল হয়ে ওঠে, যেন এতোটুকু পথ আজ হয়ে উঠেছে বহুদূর। একসময় রিক্সা পৌঁছে যায় পাখিদের বাড়ির উঠানে। পাখি রিক্সা থেকে লাফ দেয়। তাড়াতাড়ি করে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে রিক্সা ভাড়া দিয়ে বিদায় করে। দুই হাত বোঝাই ব্যাগ নিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে চিৎকার করে করে ডাকে--------

: দাদি! দাদি! ও দাদি----------

: মা! ও মা--- আমি তোমাগো পাখি। আমি বাড়িতে, দেখ! তোমাদের কাছে চইলা আইছি। দেখ দেখ মা! আমি তোমার জন্য কতগুলান এ্যালুমিনিয়ামের পাতিল কিনা আনছি। তোমার আর কারোর বাড়ির থেকে হাড়ি ধার করতে হইবো না। পাখি থেমে যায়। কোথাও কোন সাড়া-শব্দটি যেন নেই।

বাড়ি নিঃঝুম। বুঝি কোথাও কেউ নেই। এদিকে ওদিকে ঘরের দুয়ারে দাঁড়ায় দেখে অপরিচিত মহিলা।

: কে ? কে আপনে ?

: তুমি কে ? তুমি কি আমাগো আগের ঘরের মাইয়া- পাখি? পলাইয়া গেছিলা কই ?

: পাখি বুজি! পাখি বুজি তুমি আইসো? ধূলাবালি মাখা বড্ড অপরিষ্কার ভাই-বোনগুলো পাখিকে জড়িয়ে ধরে। পাখিও।

পাখি ভাইবোনদের বলে- আমাগো মায়েরে দেখিনা। দাদি! বাবায় কই? কামে গেছে? তিনজন নিষ্পাপ শিশু অঝোরে কাঁদতে থাকে। হিক তুলে তুলে কাঁদে। প্রায় সমস্বরে বলতে থাকে -------

: আমাগো মা মইরা গেছে।

: দাদি তো সেই কবেই মইরা গেছে ।

: পাখি ও পাখি! তুমি আমাগো আর কখনো ছাইড়া যাইবা না কও। ততক্ষণে পাখিদের বাড়িতে দুই চারজন করে পাড়া পড়শিরা এসে জড়ো হয়।

: ঘরে অপরিচিত মহিলার দিকে তাকিয়ে পাখি বলে- ঐডা আবার কে?

: আমাগো নতুন মা। বাবায় বিয়া করে আনছে।

: আবার! আবারও সৎ মা!

পাখি আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই হাত তুলে চিৎকার করতে থাকে। চিৎকার করতে করতে বলতে থাকে- আল্লারে আল্লাহ! আমার আল্লাহ! মায়ের প্যাট থেকা জন্ম দিছো। কিন্তু আমাগো মাকে দিলা না!! আমরা কি দোষ করছি?

পাখি আবার একটা কালো আকাশ দেখে। যেখানে নিঃশব্দে হাজারো গন্তব্যহীন পাখিরা উড়ে ফেরে। ওদের অজানা ভয়গুলো মেঘেদের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়।

তিন ভাইবোন পাখির বুকের পাঁজরের ভিতর ঢুকতে চায়। পাখিও দীর্ঘদিনের তার ফাঁকা বুকের পাজরের ভিতরে জোরে আঁকড়ে ধরে। পাখি ভাই-বোনদের শক্ত করে আঁকড়ে ধরে প্রশান্তি পায়। ওদের সুরক্ষিত রাখতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ।

লেখক: **ওয়াহিদা বানু স্বপ্না,** নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয়-বাংলাদেশ।

শিশু যৌন হয়রানি

চিররঞ্জন সরকার

আমাদের দেশে শিশুদের উপর যৌন হয়রানির বিষয়টি নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। সবাই চায় বিষয়টি এড়িয়ে যেতে বা গোপন করতে। অথচ শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন সমস্ত বিশ্বজুড়ে একটা বিভীষিকাময় বিষয়। এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে কোন না কোন শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়নি! অথচ এটা নিয়ে কেউ কোন কথা বলে না। সবার মধ্যে একটা গোপন করার মানসিকতা। অনেকে আবার মনে করেন, এটা হতেই পারে। ছোটকালে কত কী হয়! একটু আদর, একটু শরীর স্পর্শ করলে কী-ই বা এমন ক্ষতি হয়!

অথচ যে শিশুটি এই নির্যাতনের শিকার, সে কিন্তু সারাজীবন ধরে একজন খণ্ডিত মানুষ হিসেবে রয়ে যায়, যতদিন বেঁচে থাকে, একটা ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে বাঁচে হয়। এটি এমন একটি ঘটনা, বাবা মাকে বলা যায় না, বড় হয়ে মামলা করার, ন্যায়বিচার পাবার কোন উপায় থাকে না, শরীর-মন-সম্পর্ক সব কিছুকে একটা দূরারোগ্য ক্যানসারের মত কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। সামাজিকভাবে নিগৃহীত হওয়ার ভয় থাকে। থাকে, 'বলে কি লাভ? কেউ কি বুঝবে!' মনে বাসা বাধে নানা ধরনের হতাশা! কখনো কখনো আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় জীবনের!

শিশুদের প্রতি যৌন হয়রানির বিষয়টি আমাদের সমাজে অনালোচিত হলেও এটাকে কিছুতেই খাটো করে দেখা যাবে না। এসংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, শিশু-হয়রানির সত্তর ভাগই ঘটায় পরিবারের পুরুষ, নিকটাত্মীয়রা। দ্বিতীয় কাতারে আছে মুখচেনা পাড়া-পড়শী, শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধব। অচেনা লোকও যৌন হয়রানি করে, কিন্তু খুব কম। শহরে কাজের লোক, গাড়ি চালক কিংবা বিশ্বস্ত কেয়ারটেকারাও যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটায়।

আমাদের দেশে শুধু যৌন হয়রানি নয়, শিশুদের এখন ধর্ষণও করা হচ্ছে। শিশুধর্ষণ অপরাধ তো বটেই, এটা এক ধরনের মানসিক বিকৃতিও বটে। বালিকা বা সাবালিকা বা নাবালিকা সব ধর্ষণই জঘন্য। এক সময় ধর্ষণকে কোনও অপরাধ বলেই মনে করা হত না। শিশুর সঙ্গে বয়স্কদের যৌনসম্পর্কও ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আদিকালে ঘরে ঘরে শিশুবিবাহ হত। এখনও আমাদের দেশে শতকরা ৬৬ জন নারীর ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। নাবালিকা বিয়ে করাটা এক ধরনের অপরাধ। কেনানা শিশু-সঙ্গমে আর শিশু-ধর্ষণে মূলত কোনও পার্থক্য নেই। শরীরে যৌনতার বোধ শুরু না হতেই, নিতান্ত কৌতূহলে বা বাধ্য হয়ে শিশুরা সঙ্গমে রাজি হতেই পারে, কিন্তু সে রাজি হওয়া সত্যিকার রাজি হওয়া নয়।

‘১৪ বছরের কমবয়সী, ঋতুবতী হয়নি, এমন কন্যাদের প্রতি যাদের যৌন আকর্ষণ, তারা মানসিক রোগী’ এ কথা ভিয়েনার মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ক্রাফ্টএবিং বলেছিলেন ১৮৮৬ সালে। তার পর নানা দেশের নানা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নানা সময়ে ক্রাফ্টএবিং-এর মতকে সমর্থন করেছেন।

নাবালিকা-সাবালিকা সব ধর্ষণই বহাল তবিয়তে চলে সে সব দেশে, যে সব দেশের বেশির ভাগ পুরুষ কন্যাদের ভোগের বস্তু, দাসী-বাঁদি, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, বুদ্ধিশুদ্ধিহীন প্রাণী, নিচু জাতের জীব ইত্যাদি হিসেবে বিচার করে; যেসব দেশে পতিতালয় গিজগিজ করছে, শত শত শিশুকন্যাকে যৌন পাচারের শিকার করা হচ্ছে; যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, স্বামীর অত্যাচার, পণের অত্যাচার, পণ বা যৌতুক অনাদায়ে খুন এই দুর্ঘটনাগুলো প্রতিদিন ঘটছে, ঘটেই চলছে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ষণ আর যা কিছুই হোক, যৌনসঙ্গম নয়। যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্য কেউ ধর্ষণ করে না। প্রায় সব ধর্ষকেরই স্থায়ী যৌনসঙ্গী আছে। ধর্ষণ নিতান্তই পেশীর জোর, পুরুষের জোর, আর পুরুষাঙ্গের জোর। মোদ্দা কথা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের আরেক নাম ধর্ষণ। তথাকথিত পৌরুষের বিকার বা বিকৃতি থেকেই আসে ধর্ষণ-প্রবণতা।

শিশু যৌন হয়রানি একটি ব্যাপক পরিসরের শব্দ। একজন বয়স্ক ব্যক্তি যে কোনভাবে কোন শিশুকে শারীরিকভাবে হালকা বা গুরুতরভাবে যৌন হয়রানি করলে বা পর্নগ্রাফি তৈরিতে শিশুকে ব্যবহার করলে সেটাকে শিশু যৌন হয়রানি বলা হয়।

আমাদের দেশে স্কুলপড়ুয়া ছেলেদের প্রায় সাত শতাংশ এবং কন্যাদের ১৬ শতাংশ যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে ছেলেদের তুলনায় কন্যারা এবং শহরের তুলনায় গ্রামের শিশুরা বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছে। যৌন হয়রানির কারণে শিশুর বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শৈশবে যৌন হয়রানির শিকার শিশুরা ভবিষ্যতে নিজেরা নির্যাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। তাদের যৌনকর্মী, মাদকাসক্ত হওয়া ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

যৌনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা তৈরি হবার আগেই যদি শিশুরা বয়স্ক কারও দ্বারা যৌন হয়রানির স্বীকার হয়, সেক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় পেডোফিলিয়া। এক্ষেত্রে শিশুটির প্রতি বয়স্ক ব্যক্তিটির এক ধরনের আকর্ষণ কাজ করবে, যেটা অন্যসব শিশু যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে থাকে না। আবার সব পেডোফাইল ব্যক্তিই যে শিশুকে শারীরিকভাবে হয়রানি করবে তেমনটা নাও হতে পারে।

যারা যৌন হয়রানির শিকার হয় তাদের মধ্যে অনেক সময় ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আবার এক শ্রেণির শিশু এতোটাই অল্প বয়সী থাকে যে তাদের সাথে কি ঘটনা ঘটছে সেটাই তারা বুঝতে পারে না। আর এসব ঘটনার বেশির ভাগই ঘটে ঘরের মাঝে একান্ত কাছের আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; যারা আদরের ছলে এমন সব বিকৃত কাজ করেন, শিশুরা অনেক সময়ে অস্বস্তিবোধ করলেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এটা আদর নাকি অন্য কিছু। যার ফলে তারা কারও কাছে বিষয়টি জানায়ও না, বা জানাতে যে হবে সেটাও বুঝতে পারে না। কিন্তু শিশুমনে ঠিকই এর এক বিরূপভাব জন্ম নেয়, যার স্থায়ীত্ব চিরকাল। ঐ শিশুটি কিন্তু ঐ ঘটনা কখনোই ভুলে না। যে আত্মীয়ের দ্বারা এমন ঘটনাটি ঘটলো তাকে আর সারাজীবনে সে শ্রদ্ধা করতে পারে না, এক ধরনের মানসিক দূরত্ব ঠিকই থেকে যায় দু’জনের মধ্যে। এ ছাড়াও ছেলেশিশুর তুলনায় এ ধরনের ঘটনার শিকার হওয়া কন্যাশিশুরা বড় হয়ে বেশি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায়, মানে বড় হয়ে তার যখন ছোটবেলার সেই দুঃখজনক ঘটনাটি মনে করে তার ভিতরে পুরুষদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভের জন্ম নেয়। ঘরের মানুষ ছাড়াও যারা শিশুদের নিয়ে কাজ করে যেমন গৃহশিক্ষক, যিনি বাচ্চাদের স্কুলে আনা নেওয়া করেন (ড্রাইভার হতে পারেন বা কেয়ারটেকার বা বাসার কাজের ছেলেটি), ধর্মীয় শিক্ষক, গার্লস গাইড বা বয়েজ স্কাউটের শিক্ষক, খেলাধুলার শিক্ষক, গানের বা নাচের শিক্ষক,

কোচিং-এর শিক্ষক, বোর্ডিং স্কুলের হোস্টেলের স্টাফরা, বিভিন্ন ছাত্রাবাসের শিক্ষক-কর্মীরা ইত্যাদি। তবে বাইরে ঘটনাগুলো অনেকক্ষেত্রে ধরা পড়তে পারে নির্যাতকের অস্থির আচরণ থেকে। এ ছাড়াও ছেলেশিশুই হোক বা কন্যাশিশু হোক এসব ঘটনা থেকে তারা বিভিন্ন রকমের ছোট-বড় মানসিক সমস্যা, হীনমন্যতা ও ব্যক্তিত্বহীনতাসহ আরও অনেক রকমের শারীরিক-মানসিক ক্ষতির শিকার হতে পারে। এমনকি কেউ কেউ মা-বাবা হবার উপযোগিতাও হারিয়ে ফেলতে পারেন।

জনহপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ ফ্রেড বার্লিনের মতে, যে কোন ধরনের সাইকোলজিকের ট্রমার ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ সবচেয়ে ভাল।

আমাদের প্রথম দরকার, এ ধরনের পেডোফাইল বা ইনসেস্ট বা শিশুদের প্রতি যৌন হয়রানি করার মানসিকতা যাদের আছে, প্রথমেই দরকার হলো তাদের চিহ্নিত করা। এরপর তাদেরকে বিভিন্ন কাউন্সেলিং সেন্টারে মানসিক ডাক্তারের অধীনে মানসিক থেরাপী দেয়ার ব্যবস্থা করা।

শিশুকে বারে বারে বুঝিয়ে বলা, মন খুলে শিশুর যে কোন সমস্যা যেন বাবা-মাকে খুলে বলতে পারে সেরকমভাবে শিশুর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে করে কোন কিছু তাদের কাছে অস্বস্তিকর ঠেকলেই তারা যেন সাথে সাথে বাবা-মাকে সেটা জানাতে দ্বিধাবোধ না করে।

যারা এরই মাঝে আরেকটু বড় হয়েছে মানে স্কুলে কলেজে পড়ছে, হয়তো তাদের মাঝে মাঝে কেউ কেউ এরই মাঝে এরকম ঘটনার শিকার, কিন্তু সাধারণত এগুলো লজ্জায় পরিবারের কারও কাছে শেয়ার করতে পারেনি, তাদের জন্য প্রতিটি স্কুল-কলেজে একটা সেল থাকা দরকার যেখানে তারা চিরকুটের মাধ্যমে বা দায়িত্বরত শিক্ষককে সরাসরি নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে জানাতে পারে যে কোন কিছু। শিক্ষকরাও উদার এবং সহযোগিতামূলক মন নিয়ে শিশুদের কোমল মনের ব্যাথাগুলো জানার চেষ্টা করবেন, আগ বাড়িয়েও সব শিশুকে জিগ্যেস করে জেনে নিতে পারেন। তারপর হয়রানির শিকার হওয়া শিশুর বাবা-মাকে বিস্তারিত জানাতে পারেন, প্রয়োজনে শিশুটির মানসিক থেরাপী বা কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন, যাতে করে শিশুটি মানসিক ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারে।

পুরুষতান্ত্রিকতার সুযোগ নিয়ে অনেকে এগুলো করে, পেছনে কারণ যেটা হোক, ফলাফল হলো তাদের মানসিক বিকৃতি ঘটে, এটাকেই বিশেষজ্ঞরা রোগ বলছেন। রোগ বলা মানে কিন্তু এটা নয় যে তাকে অপরাধ বা ভুলের শাস্তি দেয়া হবে না, বরং যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাদের সাজার ভিতরে থাকা অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেও নজর দিতে হবে, এটাই আসল কথা।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেকের উচিত শিশুদের জন্য এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে শিশুরা কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হবে না। এ জন্য প্রয়োজন জনে জনে সচেতনতা গড়ে তোলা, প্রথমেই নিজের পরিবারকে সচেতন করা, এরপর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের।

৫ বছর বয়স হলেই শিশুকে আলাদা বিছানায় শুতে দেয়া উচিত। কন্যাশিশুকে কোথাও একা বেড়াতে পাঠানো (মামা/চাচা/খালা/নানা বাড়ি) ঠিক না। শিশুদের বিনোদন ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা উচিত। বন্ধুর বাসায় রাত কাটাতে দেয়া উচিত না। পারিবারিক দ্বন্দ্ব আছে এমন আত্মীয়দের থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা উচিত।

পিডোফাইল বা শিশু-ধর্ষক মানসিক রোগী। ওদের মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আর বাদ-বাকিদের সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। কী কারণে নাবালিকা ধর্ষণ করেছে, তার কারণ বের করে, সেই কারণকে নির্মূলকরণের চেষ্টা করতে হবে। কন্যাদের যৌনবস্তু ভাবার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। পতিতালয় বন্ধ করতে হবে। কারণ পতিতালয়গুলোতে প্রতিদিন অসংখ্য শিশু ধর্ষিতা হচ্ছে। শিশু-পর্নগ্রাফি বন্ধ করতে হবে, কারণ এ সব পর্নগ্রাফি লোককে শিশু-ধর্ষণে উদ্বুদ্ধ করে। রাস্তাঘাটে, অফিসে, আদালতে ও দোকানপাটে

কন্যাদের যৌন হয়রানি, শিশুবিবাহ, পণপ্রথা, জাতপাত বন্ধ করতে হবে, কন্যাদের শিক্ষিত, স্বনির্ভর করতে হবে। স্কুলের শুরু থেকেই নারী-পুরুষের সমানাধিকারের শিক্ষা সব শিশুকে দিতে হবে। শিশুরা ভাল শিক্ষা আর ভাল পরিবেশ পেলে ভাল মানুষ হয়। ধর্ষকদের জীবন কাহিনী ঘাঁটলে দেখা যায়, বেশির ভাগেরই বিচ্ছিরি একটা শৈশব ছিল, ভাল শিক্ষাদীক্ষা বলতে কিছুই ছিল না, মারামারি দেখতে দেখতে, ঘৃণা দেখতে দেখতে, পৌরুষিক পাষ-তা দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। এগুলোই শিখেছে। শেখা সহজ, না-শেখা সহজ নয়। শিখে ফেলা পুরুষতন্ত্র আর নারী বিরোধী-কুসংস্কারগুলো যে করেই হোক 'না শেখা' বা 'আনলার্ন'-এর ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।

আবার খুব গুরুতর কিছু ঘটে থাকলে যেন প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থাও নেয়া যায়, তার জন্য পর্যাপ্ত আইনি সুযোগ-সুবিধা, যাতে সহজেই অভিযোগ জানানো যায়, সে রকম ব্যবস্থা করা দরকার।

এখন যে কোন ধরনের শিশু যৌন হয়রানিই হোক না কেন, সাধারণত কন্যাশিশুরা যেহেতু ছেলেশিশুদের চেয়ে বেশি এর শিকার হয় (ভবিষ্যতে এরাই হবে মা, এরাই ভবিষ্যতে তার পরিবারের শিশুদের দেখভাল করবে), তাই এসব কন্যাশিশুদেরকেই সবার আগে সব রকম হয়রানি থেকে সুরক্ষা দিতে হবে, তাদের সচেতন এবং সুস্থ করে তুলতে হবে।

লেখক: চিররঞ্জন সরকার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি ডিভিশন, ব্র্যাক।

কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য নয়

ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান

ইসলাম কন্যাশিশুকে সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে ঘোষণা করেছে এবং যাবতীয় বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিটি মানবসন্তান পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রাক-ইসলামি যুগে যখন কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়াকে অপমানজনক মনে করে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো, তখন নবী করিম (সা.) কন্যাশিশুর প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদের মর্যাদার যে উচ্চাসনে সমাসীন করেছিলেন, তা ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট।' (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

ইসলাম মানবজাতিকে এ ধারণায় দীক্ষিত করেছে যে, পুত্র-কন্যা দুই সন্তানই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিশেষ উপহার। সন্তানকে চোখজুড়ানো সম্পদ বিবেচনা করে পুত্র বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে এ দুইয়ের মধ্যে কোনো রকম বৈষম্য বা পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সাধারণত পুত্রসন্তানের প্রতি যে অধিক যত্ন নেওয়া হয়, কন্যাশিশুর প্রতি তা করা হয় না। অথচ নবী করিম (সা.) সুসংবাদ প্রদান করে বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কন্যাই উত্তম।' (মুসলিম)

দরিদ্র পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে কন্যার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে ছেলের লেখাপড়া কষ্টে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অথচ কিশোরীটিও যে পরিবারে শ্রম ও মেধা দিয়ে সাহায্য করে, তার হিসাব কেউ রাখে না। তারা মেধাবী নয়, সৃষ্টিশীল নয়, এমন অজুহাতে অনেক সময়ই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরিবার তাদের প্রাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা, মানবাধিকার রক্ষা না করার সমান অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

কন্যাশিশু ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য বেহেশতের শুভবার্তা বয়ে আনে এবং সংসার জীবনকে স্নিগ্ধ মায়া-মমতায় ভরে রাখে। তাই এরা ঘরের প্রাণময় সৌন্দর্য; কিন্তু অনেকেই কন্যাসন্তান জন্ম নিলে খুবই বিব্রতবোধ করেন। একাধিক কন্যা হলে অত্যন্ত হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ কন্যাশিশু জন্ম দেওয়ার অপরাধে স্ত্রীকে নির্যাতন করে

থাকে। এমনকি তালাক দেওয়ার মতো নির্মম ও অত্যন্ত জঘন্য পাপের পথেও পা বাড়ায়। অথচ মহানবী (সা.) পিতার অন্তরে কন্যাসন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাসন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি ও সে এ রকম কাছাকাছি থাকব বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।' (মুসলিম)

সমাজ ব্যবস্থায় মনে করা হয়, বিয়েই হচ্ছে কন্যাশিশুদের একমাত্র গন্তব্য। তাই প্রয়োজনে শিক্ষাকে ব্যাহত করেও নির্দিষ্ট বয়সের আগেই তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। এখনও কন্যাশিশুর শিক্ষা অর্জনের পথে পরিবারের যথেষ্ট উদার মানসিকতার পরিচয় মেলে না। অনেক পরিবারে কন্যাশিশুকে প্রয়োজনীয় খাবার খেতে দেওয়া হয় না। কন্যাশিশুর অসুস্থতাকেও অনেক পরিবারে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পরিবারে কন্যাশিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টি চাহিদা পূরণের সুযোগ নেই। একই জায়গায় পুত্রসন্তানের জন্য খাবারের উৎকৃষ্ট অংশ যেখানে বরাদ্দ রাখা হয়, সেখানে কন্যাশিশুকে বঞ্চিত করা হয়। কিশোরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে সঠিক ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রয়োজন। খাবার-দাবার সম্পর্কিত কুসংস্কার দূর করা প্রয়োজন। সমাজে প্রচলিত নীতিকথা আর চিন্তা-চেতনা থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি অনেকেই।

নবী করিম (সা.) তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমা (রা.)-এর সঙ্গে যে ধরনের উঁচু মানের ব্যবহার করতেন, তা ছিল তৎকালীন সমাজের নিয়মকানুন-বহির্ভূত। তিনি কন্যাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, যেখানেই যেতেন শিশু ফাতেমাকে সঙ্গে নিয়ে বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার প্রথম সন্তান মেয়ে।' নবী করিম (সা.) কন্যাশিশু তথা নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে হজরত ফাতেমা (রা.)-এর মাধ্যমে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এবং একই সঙ্গে তাঁকেও একজন আদর্শ রক্ষক হিসেবে গড়ে তুলে বলেন, 'কন্যাসন্তান সুগন্ধি ফুল, আমি তার সুগন্ধ গ্রহণ করি আর তার রিজিক তো আল্লাহর হাতে।'

আজকের কন্যাশিশুই আগামী দিনের একজন নারী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়ামক শক্তি। অথচ বঞ্চনার কারণে কন্যাশিশুরা পরিণত বয়সে ছেলেদের মতো মানবসম্পদ হয়ে ওঠতে পারছে না। এভাবে কন্যাশিশুকে অধিকার বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে যে বৈষম্যের সূত্রপাত হয়, তার খেসারত শুধু কন্যাশিশু আর নারী নয়, গোটা জাতিকে দিতে হয়।

এই কঠিন বাস্তবতায় ইসলামে কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা ও বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার কাজ করতে হবে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে কন্যাশিশুর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য, অবহেলা ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র লিঙ্গভেদে তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো যাবে না। কন্যাশিশুর রিজিক আল্লাহ দান করেন, তার জীবন-জীবিকা ও উপযুক্ত সময়ে পরিণয় বন্ধনের দায়ভারও মহান সৃষ্টিকর্তা গ্রহণ করেন।

সন্তান কন্যা হোক বা পুত্র হোক, শিশুকে তার প্রাপ্য অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়াই পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব। সেখানে লিঙ্গভেদে কোনো বৈষম্য বা বঞ্চনা কারও কাম্য নয়। তাই কন্যাশিশু নিয়ে নিরর্থক দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। অতএব, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, কন্যাসন্তানের জন্মে চিন্তিত না হয়ে আনন্দিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সন্তানের প্রতি কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ না করে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখা উচিত। আসুন, জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের স্বার্থে ইসলামে কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা ও সার্বিক বিকাশের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, আমরা কন্যাসন্তান লালনের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করি।

লেখক: ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান- চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ ও দাওয়াহ বিভাগ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রসঙ্গ নারীমুক্তি ও শ্রেণী বৈষম্য

তপতী সাহা

নারী পুরুষের সমতা বা সম-অধিকার অর্জন বিষয়ক আলোচনায় "শ্রেণীবৈষম্য এই বিষয়টি বিভিন্ন সময় প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। নারীবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, যেদিন থেকে নারী মুক্তির লড়াই শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে। "নারীমুক্তি" ও "শ্রেণীবৈষম্য" এই মতবাদ মার্কসীয়' নারীবাদী ত্বাত্তিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মার্কসীয় ত্বাত্তিকদের একটি অংশ মনে করেন, সমাজে শ্রেণীবৈষম্য দূর হলেই নারীমুক্তি ঘটবে। এদেরই আরেকটি অংশ মনে করেন, নারীমুক্তি ও শ্রেণীবৈষম্য নিরসনের আন্দোলন যুগপৎভাবে চালাতে হবে এবং একটির সাথে আরেকটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, দ্বিতীয় মতের পক্ষেই জোরালো যুক্তি ও সমর্থন পাওয়া যায় বেশি। কারণ নারীমুক্তির জন্য পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। পুরুষতন্ত্রের রূপ ও প্রকাশ শ্রেণীভেদে ভিন্ন হলেও নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এটি সার্বজনীন। তাই নারীবাদীরা মনে করেন, নারীর সামগ্রিক মুক্তি তথা সমাজের মুক্তির জন্য শ্রেণীবৈষম্য ও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নারীর শ্রেণীগত অবস্থান ও পুরুষতন্ত্রের সাথে তার সম্পর্ক একটি অত্যন্ত জটিল ও অনুধাবনযোগ্য বিষয়। নারীমুক্তির লড়াইয়ে সঠিক কৌশল অবলম্বন করতে হলে নারীর শ্রেণীগত অবস্থান ও পুরুষতন্ত্রের জটিল দিকগুলো বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। নারীকে আমরা দেখি, সম-অধিকারের আন্দোলনে বা নারী অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তাঁর নিজস্ব শ্রেণী অবস্থান থেকে সরে আসতে হয়। অর্থনৈতিক শ্রেণীগত অবস্থানে স্থির থেকে নারীমুক্তির লড়াই ও আন্দোলন অংশগ্রহণ করা। যেমন, একজন বস্তিবাসী নারীর জীবনের বাস্তবতা আর ধনীক শ্রেণীর নারীর জীবনের বাস্তবতা এক নয়। যদিও এই দুই নারীই পুরুষতন্ত্রের শিকলে বন্দি। এই শ্রেণীগত অবস্থান বলতে মোটাদাগে অর্থনৈতিক শ্রেণীকেই বোঝানো হয়। কিন্তু চেতনাগত বা আদর্শগত অবস্থান হচ্ছে শ্রেণী নির্ধারণের আর একটি সূচক। শ্রেণী ও পুরুষতন্ত্র এই ত্বাত্তিক আলোচনাটি সহজভাবে বোঝার জন্য আমি কিছু উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। অথবা সত্যি বলতে ঐ ঘটনাগুলোই আমাকে শ্রেণী বৈষম্য ও পুরুষতন্ত্রের এই আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে সেটা বলাই সঠিক।

কিছুদিন আগে, এক সকালে অন্যান্য দিনের মত আমি যখন স্নান সেরে অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় অনেক লোককে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ করতে শুনলাম। কৌতুহল বশতঃ জানতে চাওয়ার আগেই আমার স্বামী ঘরে এসে বললেন, তাড়াতাড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের হেলপ লাইনে একটা ফোন কর। কারণ আমাদের বাসার সামনে চারতলা বাড়িতে (৪র্থ তলা) একজন নারী গৃহকর্মীর উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। ঐ নারী গৃহকর্মীটি ফ্লাটের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে এবং তাঁকে বাঁচাতে আশেপাশের

লোকজনের সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করছে। এই নারীটির উপর নির্যাতনের মাত্রা এতই তীব্র ছিল যে, তাঁর মাথা থেকে রক্তপড়া বা আঘাতের চিহ্ন দুর থেকে বোঝা যাচ্ছিল। যেটি আমার বাসার নারী গৃহকর্মীটি আমাকে জানালো। এরকম একটি ঘটনার কথা জানামাত্রই আমি নারী নির্যাতন বিরোধী হেলপ লাইনে (১০৯২১) ফোন করলাম। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ক্রমাগত প্রায় ১৫ মিনিট চেষ্টা চালানোর পরেও হটলাইন থেকে আমার ফোন কেউ রিসিভ করলো না। নারী নির্যাতন বিরোধী হটলাইনের অবস্থা যদি এরকম হয়, তাহলে সেটি থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে। তবে এই মুহুর্তে নারী নির্যাতন বিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য নয়। প্রয়োজনে পরবর্তীতে অন্য কোন সময়ে করা যাবে। এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হটলাইনে ব্যর্থ হয়ে আমি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে কর্মরত আমার পরিচিত একজন উপ-পরিচালককে ফোন করলাম। আমার জানা ছিল যে, হটলাইনটি ওখান থেকেই পরিচালনা করা হয়। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ যে, তিনি আমার বক্তব্য শোনার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আমাকে জানালেন এবং বললেন, আপনি এখন আবার ফোন করলে ওঁদেরকে পাবেন। উনার পরামর্শ অনুযায়ী তখনি নারী নির্যাতন বিরোধী হেলপ লাইনে ফোন করলাম এবং নারী নির্যাতনের খবরটি জানাতে সক্ষম হলাম। ইতোমধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিট পার হয়ে গেছে। আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় অনেক লোকের ভিড়, তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা, মন্তব্য ও নির্যাতিত গৃহকর্মীকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা সবই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এর মাঝে আমি আরও কয়েকজন পরিচিত বন্ধুদের ফোন করে মিডিয়াকে জানানোর চেষ্টা করলাম। একটু পরেই নিকটস্থ থানা থেকে পুলিশ চলে আসে এবং নির্যাতিত গৃহকর্মী ও নির্যাতনকারী স্বামী-স্ত্রীকে পুলিশের গাড়িতে করে থানার উদ্দেশ্য রওনা দেয়। এরপর যথারীতি আমি অফিসে গেলাম এবং নির্যাতিতা নারীটি যাতে সুবিচার পায় সেজন্য (ইউএনডিপি) UNDP পরিচালিত পুলিশ রিফর্ম প্রকল্পের একজন পরামর্শকে পুরো বিষয়টি জানালাম। আমার বন্ধু পুলিশ রিফর্ম প্রকল্পের পরামর্শক অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি জেনে নিলেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন।

গৃহকর্মীর উপর নির্যাতন কোন নতুন ঘটনা নয়। প্রায়শই আমরা এ ধরনের ঘটনার কথা পত্র-পত্রিকায় বা টেলিভিশনের মাধ্যমে জেনে থাকি। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন- বলা হয় একজন নারী কি করে আর একজন নারীকে নির্যাতন করে। অনেক সময় এমন কি একজন সচেতন (?), শিক্ষিত নারীকেও তার গৃহকর্মীর সাথে দুর্ব্যবহার ও খারাপ আচরণ করতে দেখা যায়। এখানে দুই নারীর মধ্যে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক কাজ করে। ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক, পশ্চাদপদ ও পেটিবুর্জোয়া সমাজের মানুষ তার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায় মালিকানার মধ্য দিয়ে। তাই আমরা দেখতে পাই, আমাদের চারপাশে সম্পদ আহরণের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। আমাদের পরিবারে বা ঘরে যে গৃহকর্মীটি কাজ করে- একজন কর্মী হিসাবে তাঁর আনুষ্ঠানিক বা আইনগত কোন অধিকার না থাকায় তাকে মালিকের অমানবিক আচরণ বা নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই গৃহকর্মীরা বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় এখনো অনেকটা দাস প্রথার মতই জীবন-যাপন করে। কেননা গৃহকর্মীর কাজের কোন আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে গৃহকর্মী হিসাবে তাঁর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিষয়টিও উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। তাই অনেক পরিবারই এই গৃহকর্মীটিকে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে। যে কারণে বাড়ির মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেই তাকে নির্যাতন করা হয়। বেশিরভাগ সময় পরিবারের নারী সদস্যরাই এই গৃহকর্মীর উপর তাঁদের শ্রেণী ক্ষমতার ব্যবহার করে।

এই প্রসঙ্গে আমি শ্রেণীগত অবস্থানের আরেকটি দিকে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। নির্যাতনের যে ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো সে ব্যাপারে আমার বাড়ির গৃহকর্মীটির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও তাঁর মনের ওপর যে প্রভাব পড়েছিল সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। স্বভাবতই এই ঘটনাটি আমার পরিবারের সকলের মনে রেখাপাত করেছে। কিন্তু আমার গৃহকর্মীটির মনের মধ্যে প্রতিবেশীর বাড়িতে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের এই ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

এখানেও শ্রেণীগত অবস্থানের বিষয়টি চলে আসে। আমি খুব যত্ন সহকারে লক্ষ্য করেছি যে, আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ফলাফল জানার জন্য সে আমাকে বার বার প্রশ্ন করেছে এবং জানতে চেয়েছিল নির্যাতনকারীদের কোন শাস্তি হবে কিনা? প্রতিটি সংবেদনশীল মানুষই অপরাধ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং প্রতিকার চায়। আমার গৃহকর্মীটির ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সে যখন বলে, "গরীব বলে কি আমরা মানুষ না, পছন্দ না হলে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু গায়ে হাত দিবে কেন"? ভীষণ সত্যি কথা। একজন মানুষের কখনই অন্যকে শারীরিক আঘাত করার অধিকার নেই। এই কথাটি যেমন একজন গৃহকর্মীর ক্ষেত্রে মানা উচিত, তেমনি একইভাবে প্রযোজ্য যখন একজন পুরুষ তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালায় ও শারীরিকভাবে আঘাত করে। প্রতিটি নির্যাতনের পেছনে "মালিকানা" ধারণাটির একটি বিকৃত চর্চা করা হয়। এখানেই শ্রেণী ও পুরুষতন্ত্রের সম্মিলন ঘটে। গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনাটি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্যে করে কিভাবে একটি অর্থনৈতিক শ্রেণী আরেকটি অর্থনৈতিক শ্রেণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

এরপর শ্রেণী সম্পর্কের আরেকটি দিকে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। যার মাধ্যমে বোঝা যাবে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেয়ে কিভাবে নারী তার শ্রেণী অবস্থান থেকে সরে আসে। আমার ১৪ বছর বয়সী একটি কন্যাশিশু আছে। আমরা যারা নিজেদেরকে জেন্ডার সংবেদনশীল বা সচেতন নারী হিসাবে দাবী করি তাঁরা তাদের কন্যাশিশুকে নিয়ে অনেক ধরনের আশংকায় থাকি। এর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, কন্যাটিকে পুরুষের বিভিন্ন ধরনের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা। কারণ প্রতিটি নারী জানে শৈশব কৈশর অতিক্রান্ত হয়ে তাকে যৌবনে পদার্পন করার আগে কত ধরনের অপ্রীতিকর ও কুৎসিত আচরণের মুখোমুখি হতে হয়। তাই মা হিসাবে একটি কন্যাকে সে অসুস্থ অভিজ্ঞতা বা হয়রাণি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সব সময় এই সচেতনতা শিশু বা কিশোরী মেয়েদের রক্ষা করতে পারে না। সে জন্য আমরা পারিবারিকভাবে অনেক ধরনের সুরক্ষার চেষ্টা করি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাড়ির নারী গৃহকর্মীটিকে সচেতন করে গড়ে তোলা। আমার সম-অর্থনৈতিক শ্রেণী বা সম-শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষদের কাছ থেকেও যে বিপদের আশংকা থাকতে পারে। সেটিও গৃহকর্মীটিকে বুঝিয়ে দিতে হয়। একজন নারী হিসেবে সে আমাকে আশ্বস্ত করে যখন গৃহকর্মীটি বলে "দিদি আপনি চিন্তা করবেন না, আমি জানি কিছু পুরুষ কিভাবে মেয়েদের উপর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে। সে আরও বলে অনেক ছোট বেলায় বিধবা হয়ে লোকের বাড়িতে কাজ করে আজ এ পর্যন্ত এসেছি।" এখানে পুরুষ মানুষ বলতে সে যাদেরকে বোঝায় তাঁরা সকলেই শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে ভিন্ন অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে বাস করে। কিন্তু যখন সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পুরুষ তাঁর একই শ্রেণীভূক্ত একটি শিশু বা কিশোরী নারীকে যৌন হয়রানী করে, তখন পুরুষতন্ত্র ও শ্রেণীর ক্ষমতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর তখনি আমি বা আমার মত অসংখ্য নারীকে তাঁর বা তাঁদের কন্যাদের সুরক্ষার জন্য একজন গৃহকর্মীর উপর নির্ভর করতে হয়, যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান থেকে একেবারেই ভিন্ন। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, শ্রেণীস্বার্থের বিবেচনায় ও সামাজিক তথাকথিত মর্যাদা রক্ষার খাতিরে যে পুরুষটির সাথে আমরা সাথে কাজ করি, গল্প করি ও আড্ডা দেই তাঁর কাছেও কিন্তু অনেক সময়ে আমরা আমাদের কিশোরী মেয়েটিকে একা ছাড়তে সাহস করি না। বরং সেখানে সন্তানের সুরক্ষার জন্য সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর গৃহকর্মী নারীটির ওপরই নির্ভর করতে হয়। এখানে অর্থনৈতিক শ্রেণী ও চেতনাগত শ্রেণী দ্বন্দ্ব। এভাবেই আমরা বুঝতে পারি- পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সঠিক লড়াইয়ে নারী কিভাবে শ্রেণীগত অবস্থান থেকে সরে আসে। জীবনে ছোট বড় অনেক অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পুরুষ ও নারী উভয়েই তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য পুরুষতন্ত্রের পক্ষে কাজ করে। যেমন-অনেক নারীকে দেখা যায় পুরুষের অন্যায় এবং নির্যাতনের প্রতিবাদ না করে বরং নির্যাতনকারী পুরুষের পক্ষ অবলম্বন করে। যেমন-একজন ধনীক শ্রেণীর পুরুষ যখন কোন দরিদ্র নারীকে শোষণ ও নির্যাতন করে তখন প্রায়শই দেখা যায় ধনীক শ্রেণীর নারীটি পুরুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে চেতনাগত অবস্থান বা পুরুষতন্ত্র বিষয়ক ধারণাগত স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা না থাকার কারণেই নারী তাঁর স্বার্থ বুঝতে পারে না।

অথচ স্ববিরোধীতা ধরা পড়ে তখনি, যখন একজন তথাকথিত শিক্ষিত ও অর্থশালী পুরুষ তাঁর সম-শ্রেণীর কোন নারীকে নির্যাতন করে বা অন্যায় আচরণ করে। যার সবচেয়ে বাস্তব ও কঠিন উদাহরণ হচ্ছে প্রতিনিয়ত স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্যাতন, খুন ও অত্যাচারের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে। পরিবারের মধ্যে একজন নারী বা কন্যাশিশু যখন বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয় তখনি শ্রেণী ও পুরুষতন্ত্রের দ্বন্দ্বটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই কারণেই নারীবাদীদের একটি শক্তিশালী ধারা বিশ্বাস করে পুরুষতন্ত্র ও শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে পৃথক কৌশল অবলম্বন করে লড়াই করা প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্যেই তাঁদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা প্রয়োজন। শুধু শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করলে পুরুষতন্ত্রের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। তাই পুরুষতন্ত্র ও শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই সম্ভব একটি সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

লেখকঃ তপতী সাহা, নারীবাদী লেখক, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, ইউএন উইমেন ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সাংবাদিকতায় নারীর এগিয়ে চলা সমাজ বিকাশের অন্যতম বড় শর্ত

দিল মনোয়ারা মনু

আমরা প্রায়ই বলে থাকি নারী সমাজ পিছিয়ে আছে এবং এ কথা বলে কিছু মানুষ এক ধরণের দায় এড়াবার পথ খোঁজেন। কিন্তু আমরা কি কখনো তলিয়ে দেখি যে, নারী সমাজ কি পিছিয়ে আছে, নাকি তাদের পেছনে ঠেলে রাখা হচ্ছে? এর জন্য দায়ী কে? পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজপতিদের চিন্তা চেতনার বন্ধ্যাত্ব নয় কি? এই সচেতনতা যতদিন না সবার মনে, বিশেষভাবে নারীদের মধ্যে পুরোপুরি আসছে ততদিন যথার্থ অর্থে নারীর মুক্তি বা স্বাধীনতা আসবে না। তবে সময়ের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পেছনের দিকে তাকালে আমাদের কখনো কখনো হতাশই হতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নারীর অবস্থানে বহু পরিবর্তন এসেছে। নারী এগিয়েছে শিক্ষায়, বহু উচ্চ পদে নারী দক্ষতার সাথে কাজ করছে। প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রাখছে তারা। কিন্তু সত্যিকার অর্থে নারীর বন্দিত্ব ঘুচছে কি? এই উপলব্ধি যত গভীর হবে, ততই তার যথার্থ মুক্তির পথ একটু একটু করে উন্মুক্ত হবে। কেবল অর্থনৈতিক বা সামাজিক সূচক দিয়ে নারীর এই অবস্থানের বন্দীদশা পরিমাপ করা যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন সূচক তৈরিতে নীতি নির্ধারক ও সমাজবিজ্ঞানীর যৌথ ভূমিকা।

নারীর ক্ষমতাহীনতার দু'টি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র রয়েছে- একটি পরিবার, একটি সমাজ। কাজেই নারীর ক্ষমতায়নের সংগ্রাম সব সময় দ্বিমাত্রিক। দুক্ষেত্রেই তাদের ক্ষমতার লড়াই করতে হয়। কারণ সংসার ও সমাজ যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনই সমাজের মধ্যে অর্থনীতি, রাজনীতিও বিচ্ছিন্ন নয়। তাই দুক্ষেত্রেই ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজেই নারীকে সামগ্রিকভাবে ক্ষমতার জন্য লড়াই করতে হবে এবং সে লড়াই হতে হবে একে অপরের পরিপূরক। যার ফলে নারীর অংশগ্রহণে সমান সুযোগ এবং সমান সক্ষমতা আসবে। আর এর মধ্য দিয়েই দৃঢ় হবে রাজনৈতিক উপলব্ধি। নারী গ্রহণ করতে পারবে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জ। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি অস্বীকৃত কর্মক্ষেত্রে কিংবা সামাজিক অঙ্গনে নারী কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সমাজে অবদান রেখে সমাজপ্রবাহকে গতিশীল করে তুলছে। ছোট একটি উদাহরণ, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত রেখে সরাসরি ভোটে তাদের নির্বাচনের বিধান রাখা হলো। সংশয় ছিল অনেকের মনে, এত নারী ইউনিয়ন পর্যায়ে পাওয়া যাবে তো? কিন্তু এই সামান্য সুযোগটুকু গ্রহণ করতে, এই নির্বাচনকে অর্থবহ করে তুলতে তারা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তা তাক লাগিয়ে দেবার মতো ব্যাপার। কিন্তু স্রোতধারার মতো তাদের অগ্রযাত্রাকে আমরা বিকশিত করার কোন সুযোগ করে দেই নি। নির্বাচন পরবর্তীকালে দায়িত্ব পালন ও সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ তাদের দেয়া হয়নি। এই বিপুল সংখ্যক নির্বাচিত নারীর মেধা ও শ্রম গ্রামীণ সমাজের অগ্রগতিতে আরও বড় ভূমিকা রাখতে পারলো না। এক ধরণের

ব্যর্থতা তাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ভাবতে হবে সংসদে নারী আসন নিয়েও। ভাবতে হবে এক্ষেত্রে এফারমেটিভ এ্যাকশনের কথা; যাতে এ সংক্রান্ত নীতি জড়তাবদ্ধ হয়ে না থাকে।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইনে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণের যে বিধান সংযোজনের কথা ছিল তা পূরণ হয়নি। এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির প্রত্যাশা পূরণের দাবী এখন সকল নাগরিকের। দেশে প্রথম নারী স্পিকার হয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে মন্ত্রী হিসেবে বেশ কয়েকজন নারীও এসেছেন, কিন্তু কোন নারী এখনও নির্বাচন কমিশনের সদস্য মনোনীত হন নি। যারা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কতটা দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছেন, তা এখন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রের দক্ষিণাংশের দেশগুলোয় রাজনীতিতে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। আমাদের নারী নেতৃত্বের অনেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অনেক সীমিত হলেও বাংলাদেশের মতো দেশে নারী নেতৃত্বকে গ্রহণ করার যে মানসিক উদারতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক সাধারণ মানুষের রয়েছে সে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ মানসের এই দিকটিকে কোনভাবে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। এ কথাও সত্য যে, নারী নেতৃত্বে থাকলেই নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সব সময় অগ্রাধিকার পাবে তা ভাবা ঠিক নয়। কারণ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, প্রথা, সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত থাকলেও বাস্তবে তো রাষ্ট্র জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়। দীর্ঘদিনের পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে নীতি নির্ধারণ বা প্রচলিত প্রথা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে তাই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে, নারী তার প্রাত্যহিক জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গনে অংশীদার হতে যাচ্ছেন। এই ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত এবং নির্বিঘ্ন করার জন্য এই সময়ে প্রয়োজন পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ-১৯৮৫ এর সংশোধন। প্রয়োজন সর্বজনীন পারিবারিক আইনের প্রর্বতন। এ ব্যাপারে নারী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও গণ মাধ্যমকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আর একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে সাংবাদিকতার মতো ঝুঁকিপূর্ণ, দায়িত্বশীল পেশায়ও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্র এখন স্বীকার করছে মানব সভ্যতার উন্নয়ন দ্রুততর করতে হলে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নীতিগতভাবে এটি মেনে নিলেও চর্চার বিষয়টি সহজ না হওয়ায় এই পেশায় আসতে নারীকে অনেক চড়াই উৎরাই পাড়ি দিতে হয়েছে। এই পেশায় আসা নারীরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, বাইরের কাজের ক্ষেত্রে সচরাচর নারীদের যে সব তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় সাংবাদিকতার পেশায় তা আরও বেশি প্রকট। এ ছাড়া বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার নারী সারাদেশে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত থাকলেও পেশার বৈষম্য, অংশগ্রহণে বাধা, মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা ও অবদমনের মাত্রা যথেষ্ট মাত্রায় কমে নি। যদিও আজকাল অনেক সম্পাদকই স্বীকার করেন যে, নারীরা পেশার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান, একাগ্র আর সে কারণেই তারা দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য। বছর দশেক আগে এক পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছিলো, ঢাকা শহরে কর্মরত ১ হাজার ৫ শ' সাংবাদিকের মধ্যে মাত্র ৬০ জন ছিলেন নারী। অর্থাৎ মোট সাংবাদিকের ৪ শতাংশ ছিলেন নারী। তবে চ্যানেল ও দৈনিক পত্রিকা বৃদ্ধির কারণে এ সংখ্যা বর্তমানে আরও বেড়েছে। টেলিভিশন চ্যানেল সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের বেশিরভাগ নিয়োজিত সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে। তবে আশার কথা, রিপোর্টিং এ তাদের অংশগ্রহণ প্রতিদিনই বাড়ছে। ধারণা করা হয়, এক্ষেত্রে তাদের ফেমিনাইন আপিল বা নারী মুখের আকর্ষণ কাজে লাগানো হচ্ছে। এই কারণে মুদ্রণ মাধ্যমের তুলনায় ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে তাদের খানিকটা বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। তবে আশার কথা হচ্ছে- তৃণমূলে নারী সাংবাদিকরাও সাহসের সাথে এগিয়ে আসছেন। নারী, শিশু উন্নয়ন, সুশাসন, পরিবেশ,

জলবায়ু পরিবর্তন, শিশুবিবাহ, শিশুশ্রম ও শিশুপাচার বিভিন্ন বিষয়ে তারা রিপোর্টিং করছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃত্ব এবং পত্রিকার সম্পাদনাও করছেন। একজন নারী সংবাদ কর্মী স্থানীয় প্রেসক্লাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

এক সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া একুশে টেলিভিশন ইটিভির মাধ্যমে নারী সাংবাদিকরা টিভি রিপোর্টিংয়ের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই সুযোগ তারা দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছেন বলেই বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে নারীর উল্লেখযোগ্য হারে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পত্রিকার নারী সাংবাদিকরা তাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে এখন রাজনীতি, অর্থনীতি ও কুটনীতি এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধানী রিপোর্ট পর্যন্ত দক্ষতার সাথে করছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পরিচালনা ছাড়াও তারা দৈনিকের শিফট-ইন-চার্জ পদও দক্ষতার সাথে ধরে রেখেছেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নারী রিপোর্টাররা যে পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন তা শুধু অভিনন্দন যোগ্যই নয়, অনুসরণযোগ্যও বটে। তাদের রিপোর্টিংয়ের দক্ষতা দেখে অনেক নারীর মধ্যে টিভি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেয়ার আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশে নারীর অংশগ্রহণ সংবাদ মাধ্যম অঙ্গনে এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণীতে তাদের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বললেই চলে। ব্যাপক মাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে গণমাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে নারীর কর্ম উপযোগী বা নারী বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য নীতি সংস্কারের মাধ্যমে তাদের পত্রিকা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। তাহলে পত্রিকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ক্ষেত্রে বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। তবে একই সাথে নারী সংবাদকর্মীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা অটুট রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকতা একটা সৃজনশীল পেশা, কাজেই একজন নারী সংবাদকর্মী যদি নীরব বা সরব অবদমনের শিকার হন, তবে তা নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় কোন প্রকার সৃজনশীলতার মুখ দেখতে পাবে না। তবে আমরা আশা করছি, সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতে নারীর অবস্থান ক্রমান্বয়ে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর, বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হবে। আমরা সেদিনের আশায় আছি যেদিন দেখবো জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদক হিসেবে নারীরা কাজ করে যাচ্ছেন নির্বিঘ্নে এবং সাফল্যের সাথে। সেদিনই সত্যিকার বিজয় দ্বারের উন্মোচন ঘটবে।

লেখক: দিল মনোয়ারা মনু, সাংবাদিক ও নারী অধিকার কর্মী।

ঐশীর এমন হয়ে ওঠা, দায় কার?

নাছিমা আক্তার জলি

১.

“রাত আনুমানিক দু’টার দিকে আম্মুর রুমে ঢুকি। তিনি কাত হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। প্রথমেই তার পাঁজরের নিচে পেটের পাশে চাকু দিয়ে আঘাত করি। আম্মুর ঘুম ভেঙে যায়। ছোট ভাই ঐহী জেগে ওঠে। তাকে বাথরুমে আটকে রাখি। আম্মুর পাশে এসে বসি। আম্মু বলে, আমি তোর মা না! পানি খেতে চায়। রুমে থাকা জমজমের পানি খেতে দিই। এরপর আরও কয়েকবার আঘাত করি। আম্মুর কষ্ট দেখে গলার মধ্যে আঘাত করি। এরপর তিনি মারা যান। এরপর বাবার রুমে গিয়ে মাত্র তিনটি কোপ দিয়েই বাবার মৃত্যু নিশ্চিত করি।” গত ২৪ আগস্ট, ২০১৩ আদালতে মা স্বপ্না রহমান ও বাবা পুলিশ পরিদর্শক মাহফুজুর রহমানকে হত্যার দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় দেয়া জবানবন্দিতে হত্যাকাণ্ডের এমন ভয়ঙ্কর বর্ণনা দেয় ঐশী রহমান।

কিশোরী কন্যা ঐশীর হাতে তার বাবা-মা হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশের পর দেশব্যাপী নাড়া খায় মানুষের বিবেক। সন্তান পিতা-মাতাকে হত্যা করতে পারে- একথা বিশ্বাস করতে পারছেন না অনেকেই। এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড কখনও দেখা যায়নি বলেও অনেকে মন্তব্য করছেন। তাই প্রশ্ন উঠেছে- সন্তান ঐশী কি খুন করেছে পিতা-মাতাকে? নাকি মাদকাসক্ত এক কিশোরী খুন করেছে মা-বাবাকে। নাকি ‘ইয়াবা’ নামক ভয়াবহ মাদকই খুন করেছে স্বয়ং ঐশী ও তার পিতা-মাতাকে?

২.

ঐশী রহমান। ১৭ বছরের এক কন্যাশিশু। রাজধানী ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ‘ও লেভেলের’ শিক্ষার্থী। অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নিয়মিত ইয়াবা নামক মাদক সেবন করতো সে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মাদক সেবনের পর মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে যায়। হয়ে যায় হতাশাগ্রস্ত। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যে কোনো ভয়াবহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে ফেলতে পারে। ঐশীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

তাই ঐশীর হাতে পিতামাতা হত্যাকাণ্ডটি শুধু গতানুগতিক কোনো হত্যাকাণ্ড নয়, এটি সমাজে মাদকের ভয়াবহ বিস্তার তথা সামাজিক বিপর্যয়ের নির্মম চিত্র। মাদকের নেশা ঐশীকে খুনি বানিয়েছে! প্রশ্ন আসবেই- কেন সে মাদকাসক্ত? কিভাবে তার হাতে মাদক পৌঁছালো? ঐশী কেন খুনীরূপে আমাদের সামনে হাজির হলো? এ দায় কার? যদি বলি এ দায় আমাদের, এ দায় আমাদের সমাজের।

আসলেই এ দায় সমাজ ও রাষ্ট্রের। মাদক এতটা সহজলভ্য কি করে হলো, কি করে ঐশীর মত তরুণীর হাতেও পৌঁছে যাচ্ছে? পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষন করে আমরা দেখতে পাই, ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকের বিস্তার ঘটলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে প্রতিকারের তেমন কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যে কারণে দেশে মাদক যেন আজ মুড়ি-মুড়কির মতো।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর ২০০৩ সালেও দেশে ৫ লাখ মাদকাসক্ত থাকার ঘোষণা দিয়েছিল। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থাই স্বীকার করে যে, দেশে ৬০ লাখের মতো মাদকাসক্ত রয়েছে। অধিদফতরের জরিপে বলা হয়, আসক্তদের মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগই কিশোর ও তরুণ। আর ফ্যামেলি হেলথ ইন্টারন্যাশনালের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশে সুই-সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যাও এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এ মাদকাসক্তরা শিরায় মাদক গ্রহণ করায় এইচআইভি ঝুঁকির মধ্যে থাকছে। গত বছর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, রাজধানীর মাদকাসক্তদের ৭৯ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ ও ২০ দশমিক ৬ শতাংশ নারী। মাদকাসক্তদের ৬৪ দশমিক ৮ শতাংশই অবিবাহিত। অন্য এক তথ্যমতে, দেশে বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকার মাদক কেনাবেচা হয়। এক লাখেরও বেশি মানুষ মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মাদক আমদানির জন্য প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি দেশি মুদ্রা পাচার হচ্ছে (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২০ আগস্ট, ২০১৩)।

নিযয়ন্ত্রণহীন মাদকের বিস্তৃতি এখন দেশজুড়ে ক্রমেই হয়ে উঠছে সর্বগ্রাসী। ভয়াল মাদক তারুণ্য, মেধা ও মনুষ্যত্ব- সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিনষ্ট করে দিচ্ছে স্নেহ-মায়া, ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধন। ঐশীর মত মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে খুন হচ্ছেন বাবা-মা। গত এক বছরের মধ্যে মাদকাসক্ত সন্তানদের হাতে অন্তত ২৭ জন পিতা-মাতা নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। একই সময়ে মাদকসেবী স্বামীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন নারী (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২০ আগস্ট, ২০১৩)। মাদকাসক্তির কারণেই চাঁদাবাজি, ছিনতাই-রাহাজানি, ডাকাতি ও খুন-খারাবির ঘটনা বেশি ঘটছে।

মাদকের কারণেই বিভিন্ন অপরাধ তথা সামাজিক অবক্ষয় ঘটলেও মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেই। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাঝে-মধ্যে অভিযান চালিয়ে কিছু মাদকদ্রব্য আটক করলেও মূল হোতারা থেকে থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরটির অবস্থা 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের' মতো। ১৫ কোটি মানুষের দেশে গুটিকয়েক জনবল এবং অতি সামান্য বাজেট নিয়ে যে মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, সংস্থাটি যেন তারই প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। অথচ সংস্থাটিকে শক্তিশালী করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

৩.

এ লেখার এক জায়গায় বলেছিলাম যে, ঐশীর মাদকাসক্ত হওয়া, খুনীরূপে আমাদের সামনে হাজির হওয়া, এর দায় শুধু তার একার নয়। এ দায় আমাদের, আমাদের সমাজের তথা রাষ্ট্রের। তাই ঐশীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার চেয়ে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা বেশি গুরুত্বপূর্ণ- ঐশীর মতো তরুণীরা কেন মাদকে জড়ায়? পারিবারিক জীবনের বন্ধনের চেয়ে কেন অন্যান্য সম্পর্ক তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে?

আজ ঐশীর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সবার মানসিকতার। তরুণ যুবসমাজ তথা দেশকে রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সর্বস্তরের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদক রোধে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দেয়াল। আমরা চাই, আর যেন কোনো পরিবারের ঐশীকে বাবা-মাকে খুনের দায়ে রিমান্ডে আসতে না হয়। ঐশীর ছোটভাই ঐহীর মতো নিষ্পাপ শিশুকে যেন মা-বাবাকে হারিয়ে কারও করুণায় বাঁচতে না হয়। আজ সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা যদি সমাজকে মাদকমুক্ত করতে না পারি, তাহলে

আমাদের অজান্তেই ঐশীর মত অসংখ্য তরুণ-তরুণী তৈরি হবে। যারা নিজেরা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে এবং নষ্ট হবে সামাজিক শৃঙ্খলা। যা আদৌ আমাদের কাম্য হতে পারে না।

৪.

২৪ আগস্ট, ২০১৩ আদালতে ঐশী তার জবানবন্দিতে জানায়, তার বয়স যখন ১২-১৩, তখন থেকে আব্বু-আম্মুর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি শুরু হয়। তারা তাকে মারত। এ জন্য একাধিকবার সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ঐশীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঘটনার দু'মাস আগ থেকে তাকে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। গত ৩১ জুলাই তার মোবাইল ফোনটিও কেড়ে নেয় তার মা, তখন আরও বেপরোয়া হয়ে পড়ে ঐশী। প্রথমে নিজে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে লিখে ফেলে 'সুইসাইডাল নোট'। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের বিষয়টি শেয়ার করে। কিন্তু বন্ধুরা বিশেষ করে জনি তাকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অনুরোধ করে বলে, 'তুই মরবি কেন, তোর বাবা-মারই বেঁচে থাকার অধিকার নেই। প্রয়োজন হলে তুই তোর বাবা-মাকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দে।'

উপরোক্ত জবানবন্দি থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ঐশীর সাথে তার বাবা-মায়ের এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। নানা কারণে ঐশী যেমন বাবা-মায়ের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনি একটা পর্যায়ে ঐশীর কাছে বাবা-মাও হয়ে ওঠে চক্ষুশুল। দেখা গেছে, ঐশীর মতো একজন তরুণী দিনের পর দিন গভীর রাতে বাসায় ফিরত। কেন এবং কী কারণে অল্প বয়সের একটি মেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বাসার বাইরে থাকতে পারে, যা সচেতন মা-বাবার বোঝার বাইরের কোনো বিষয় ছিল না।

যদি কেউ দাবী করেন যে, আর আট দশ জনের মত ঐশীকেও তার বাবা-মা তিলেতিলে আদর ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাহলে প্রশ্ন জাগে, কিভাবে সন্তান হয়ে বাবা-মা কে হত্যা করতে দ্বিধা করে না ঐশী? তারা নিশ্চয়ই বলবেন, মাদক নেয়ার কারণে তার মানসিক বিকৃতি ঘটেছিল। গোয়েন্দা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ঐশী অকপটে স্বীকার করেছে, অল্প বয়স থেকেই সে মাদক গ্রহণ করতো। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, ঐশীকে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে তার বাবা-মা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তাহলে তো সস্ত্রীক জীবন দিতে হতো না বাবা মাহফুজুর রহমানকে। ঐশীর বাবা পুলিশের একজন চৌকস কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি জীবনে অনেক সফল একজন মানুষ ছিলেন বলে আমরা জানি। কিন্তু কি কারণে তিনি সন্তানকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারলেন না?

আমরা অনেক সময় দেখি যে, সন্তানরা অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সাধারণত তারা বকাঝকা এমনকি মারধরও করেন। তাতেও কাজ না হলে তাঁরা তাকে ঘরের ভিতর আটকে রাখার কৌশল নেন। যেটা ঐশীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল বলে জানা যায়। অভিভাবকদের এ প্রবণতা ভুল। এতে হিতে বিপরীত হয়। মারধর না করে কিংবা আটকে না রেখে সে সময় তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করা, তার সমস্যা অনুধাবন করে তার যৌক্তিক সমাধান দেয়া খুবই জরুরি। একই সাথে বিষয়টি গোপন না রেখে প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনদের সাথে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করা এবং তাদের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে। আমাদের সমাজে সামাজিকতা ও লোকলজ্জার ভয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সমস্যাগুলো তার গোপন রাখেন। এতে শিশু ও তার পরিবার উভয়েই ক্ষতির শিকার হয়। তাই সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো- মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দ্বারা কাউন্সেলিং প্রদানের ব্যবস্থা করা। এতেও যদি কাজ না হয়, তখন মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করানো জরুরি।

৫.

ঐশীর ঘটনা আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদের শিশুরা যাতে বিপথে যেতে না পারে এবং নৈতিক গুনাবলী নিয়ে বেড়ে ওঠতে পারে সেজন্য আগে থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, যে সব পরিবারে

পারিবারিক বন্ধন ঢিলে হয়ে গেছে, বা যাদের পরিবারে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, তারাই বেশিরভাগ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। এজন্য শিশুদের যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পরিবারগুলোকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকাল সব ছেলেমেয়ের জীবনে এক ধরনের পরীক্ষা। শরীর-মনে দ্রুত লয়ে ঘটতে থাকা পরিবর্তনগুলোর সংগে মানিয়ে উঠতে না পেরে তারা নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই সময় তারা কিছুটা আবেগ প্রবণ থাকে, অনেক সময় তারা যে কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং কথায় কথায় তর্ক করা বা বড়দের অগ্রাহ্য করার প্রবনতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে অভিভাবককে উত্তেজিত হওয়া যাবে না এবং সন্ত ানদের মারধর করা যাবে না। তাদের সমস্যাগুলোকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। ওদের ভালোটা ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে। সুস্থ বিতর্কে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। সর্বোপরি তাদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে বাবা-মাকে বন্ধুর মতো পাশে থাকতে হবে।

আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যত। তাই তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল ও সতর্ক ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শিশুরা শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবতী ও উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠলে তারা পরিবার তথা রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হবে। তাই শিশুদের জন্য বিশেষ করে কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ করাকে আমাদের নৈতিক দায়িত্বে পরিণত করতে হবে; যা সামাজিক সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যও জরুরি। সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা তৈরি তথা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশুর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

লেখক: নাছিমা আক্তার জলি, সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও উন্নয়নকর্মী।

কন্যা যখন মা হয়ে যায়

ফরিদা আখতার

একটি ছোট ঘটনা দিয়ে শুরু করছি। গ্রামের দাই মাদের নিয়ে উবিনীগের একটি প্রকল্প- মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া। এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামে দাই ঘর স্থাপন করা হয়েছে- যাতে গ্রামের গর্ভবতী মায়েরা, যারা আগে এক এক জন দাই মার কাছে তাদের বাড়িতে যেতো, তারা একটি স্থানে এসে এই সেবা নিতে পারে। এখানে দাই মায়েরা গর্ভবতী নারীদের নিয়মিত পরীক্ষা করেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন, স্বাভাবিক প্রসবে বাড়িতে গিয়ে সহায়তা দেন এবং ঝুঁকিপুর্ণ হলে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। তেমনি একটি দাই ঘর আছে টাঙ্গাইলের নান্দুরিয়া গ্রামে। সেখানে নিয়মিতভাবে দাই মায়েরা বসেন। এই দাই মায়েরা বেশ দক্ষ এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। গর্ভবতী মায়েদের ঝুঁকি চিনে ও বুঝে কিভাবে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠাতে হয় তা তাদের জানা আছে। তাঁদের সাথে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর যোগাযোগ আছে। নিয়মিত কাজের অংশ হিশেবে একদিন আমি সেখানে গিয়েছি তাঁদের কাজ দেখার জন্যে, তাঁদের সাথে কথা বলার জন্যে। আমি দেখলাম- কয়েকজন গর্ভবতী মা এসেছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্যে, আরও কয়েকজন মা এসেছেন তাদের শিশুকে কোলে নিয়ে। এ ছাড়া কয়েকজন দাই এসেছেন পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করতে। বেশ আনন্দপুর্ণ পরিবেশে তাদের কাজ চলছে। এই জায়গাটুকু শুধুই নারীদের, তা দেখতে ভাল লাগছিল।

'গর্ভবতী মা' হিশেবে যারা এসেছে তাদের ব্য়স ১৮ থেকে ২০ বা ২৫ এর মধ্যে। কারও প্রথম বাচ্চা, কারো দ্বিতীয়। দেখলাম একটি মেয়ে একপাশে বসে আছে, চুপচাপ। সে প্রায় ৭ মাসের গর্ভবতী। ভাল করে চেয়ে দেখলাম তার বয়স কোনোমতেই ১৫ থেকে ১৬ এর বেশি নয়, যদিও সচেতনতা এতো বেড়েছে যে, আমাদের উৎকণ্ঠিত হতে দেখে সে তার বয়স আর একটু বাড়িয়ে বললো। এই কন্যাশিশুটি কিশোরী বয়স পার না হতেই সে নিজেই 'মা' হতে চলেছে। স্বামী কোথায় জিজ্ঞেস করতে জানা গেল বিয়ে করে কিছুদিন পরেই বিদেশ গেছে। এখন সে বাপের বাড়িতেই আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে। কপালে ঘাম। মুখখানা ক্লান্তিতে ভরা। চোখের ভেতর পরীক্ষা করে দাই মায়েরা জানালেন তার রক্তশুন্যতা আছে। সে মায়ের সাথে এই প্রথম দাই ঘরে এসেছে। কোনো বিশেষ সমস্যার জন্যে নয়, জানালো যে- এমনিতেই এসেছে। অথচ তার আসলেই যত্নের দরকার। কারণ তার পুষ্টি ঘাটতি রয়েছে। মায়ের সাথে আসা এই কন্যা কি এখন মা হওয়ার কথা?

আর একটি দাই ঘর বানতিয়ার গ্রামে, শাহজাদপুরে। এখানে দাই মায়েদের সাথে কথা বলে জানা গেল, অল্প বয়সী কন্যাশিশুদের বিয়ে দেয়া হয় খুব দ্রুত। অনেক পরিবার মনে করে বেশি বয়স পর্যন্ত কন্যাদের ঘরে রাখা ঠিক নয়। বিয়ে হলে কি হবে, স্বামীর ঘর তারা সব সময় করতে পারে না, কারণ স্বামী গ্রামে কাজ করে না। প্রায় দেখা যায় বিয়ে করেই স্ত্রীকে সন্তান সম্ভবা রেখে চলে যায় তার কাজে। তাদেরও দোষ দেয়ার কিছু নেই, জীবন

জীবিকা নির্বাহের এই সংগ্রামে এভাবেই নিয়োজিত আছে আমাদের দেশের লক্ষ কোটি মানুষ। এই দাই ঘরে দাই মায়েদের কাছে শুনলাম এমনই একটি মেয়ের কথা। কিশোরী মেয়েটি সন্তান সম্ভবা হয়েছে বটে কিন্তু সে জানে না তার কি ঝুঁকি আছে। কখন কোন সমস্যা হলে মাকে কিংবা দাই মাকে জানাতে হবে। শরীর ভাল লাগে না বলে শুয়ে থাকে, তা দেখে মাও তাকে আর বিরক্ত করে না। কিন্তু এক সময় দেখা যায় তার খুব রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং হাসপাতালে নিতে নিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই ঘটনা শুনে খুব আঁতকে উঠলাম। মনে হোল যেন মেয়েটি বড় চেনা। টাঙ্গাইলেও তো তাকেই দেখে এসেছি। খেলার মাঝেই বিয়ে হয়ে যাওয়ার ঘোর কেটে যাওয়ার আগেই মেয়েটি সন্তান সম্ভবা হয়ে গেছে। বিয়ে হয়েছে, তাই তাকে মা হতে হয়। কিন্তু তখনও তার আর শেখা হয়ে ওঠে না মা হতে গিয়ে তার নিজেকে বাঁচাবার উপায় কি। সে তখনো লজ্জার মধ্যেই থাকে, কাজেই কেমন করে সে বলবে তার শারীরিক কি সমস্যা হচ্ছে। কেউ তাকে বলেও দেয় না কি হলে কি করতে হয়। এই লজ্জায় না বলার মধ্যেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা! সে মরে যায়। আমাদের মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

একটু পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক। ইউনিসেফের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশ কন্যাশিশুরই ১৮ বছর পার হবার আগেই বিয়ে হয়ে যায় এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী বিবাহিত নারীর মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ১৫ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গেছে। এর সরাসরি ফল হচ্ছে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কন্যাশিশুরা যাদের ইংরেজীতে "টীন-এজ" বলা হয় তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ গর্ভবতী হয়ে যায়। এই কন্যাসম মায়েরাই মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে সবচেয়ে বেশি। আর যাদের ১৪ বছর বয়সের আগে সন্তান হয় সেই শিশুর মৃত্যুর হারও অনেক বেশি থাকে (*http://www.wikigender.org/index.php/Early_Marriage_in_Bangladesh*) ।

বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যুর হার রোধে সফলতা অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু যদি এখনো গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে দেখতে হয় কন্যাশিশুরাই মা হচ্ছে, তাহলে সরকারের দৃষ্টি তাদের দিকে দিতেই হবে। আমি জানি, গ্রামের মা-বাবারা বাধ্য হয়েই কন্যাশিশুদের বিয়ে দিচ্ছেন, জানি কন্যাটির কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তাদের মুখ দেখানো পথ থাকে না, তাই কি বিয়ে দিয়েই মেরে ফেলা হচ্ছে!

মনে করেছিলাম মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পটি হবে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের জন্যে, কিন্তু জানতাম না প্রকল্পটিতে কন্যাশিশুদের কথাই ভাবতে হবে, এবং তাদের জন্যেই কাজ করতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে বা শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। এই কন্যাদের নারী হবার সুযোগ কি আমরা দেবো না?

লেখক: ফরিদা আখতার, নির্বাহী পরিচালক- উন্নয়ন বিকল্পের নীতিনির্ধারণী গবেষণা (উবিনীগ) ও নারী আন্দোলন কর্মী।

অন্ধকারই শেষ না : আছে আলো, মুক্তি

বৃত্বা রায় দীপা

এক চরম অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছি আমরা। পথঘাট, কর্মস্থল, স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, হাটবাজার, পরিবহন ও ঘর- কোথাও নেই স্বস্তি, নিরাপত্তা আর সুখ। আরও একটু ভালোভাবে বাঁচার জন্যে আরও একটু আপোষ। সমাজ নেই, বন্ধু নেই, আনন্দ নেই। শুধুই টিকটিক করে যেন চলছে এক অদৃশ্য স্টপওয়াচ। দৌড়াচ্ছি আমরা। আমাদের ধাওয়া করে চলেছে উর্দ্ধমূখী বাজারদর, রক্তের চিনি আর বুকের চিনচিন। প্রতিপদে ঠকে যাওয়ার শঙ্কা। মানুষ যেন ক্রমাগত সরে যাচ্ছে মানুষের কাছ থেকে। সুখের নীড় হয়ে পড়ছে অবিশ্বাসের জতুগৃহ আর পরমপ্রিয় সন্তান আজ হন্তারকের ভূমিকায়। এ কোন বাংলাদেশ আজ আমাদের চোখের সামনে?

হাজারো দু:সংবাদের ভীড়ে খবরের কাগজের কয়েক কলামজুড়ে গা হিম করে দেয়া খবর। কিশোরী কন্যা কুপিয়ে হত্যা করেছে নিজের বাবা মাকে। বলছি ঐশী রহমানের কথা। ঐশী কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, বরং ঠিক এই সময়ে আমাদের সমাজের চলমান অবস্থার এক টুকরো ছবি। যা আমাদের স্তম্বিত করে, দুমড়ে মুচড়ে দেয়। অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমাদের সত্ত্বার গভীরে রক্তক্ষরণ চলে। কেন এমন হলো?

ঐশী আত্মসমর্পন করেছে পুলিশের কাছে। স্বীকার করেছে বাবা মা হত্যার দায়। বর্ণনা করেছে চার ঘন্টাব্যাপী ঘটানো খুন ও পলায়নের ঘটনা। হতভম্ব দেশের মানুষ, একইসাথে ক্ষুব্ধও। কিভাবে এতোটা হিংস্র হয়ে উঠলো মেয়েটি? ঐশীর মাঝে জন্ম নেয়া হিংস্রতার পিছনে প্রচুর কারণ ছিল। এনিয়ে নানা মতান্তরও আছে। তবে আমার সামনে বারবার যে বিষয়টি আসে তা হলো- ঐশীর একাকীত্বের বিপন্নতা। পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, বারবার স্কুল বদল, সহপাঠী-বন্ধু বদল সর্বোপরি শিক্ষার পরিবেশ বদল তাকে ঠেলে দিতে থাকে এক ভয়ংকর একাকীত্বে। পারিবারের পরিচিত উষ্ণতা হারিয়ে তার সত্ত্বা ক্রমশ চলে যেতে থাকে অচেনা হিমঘরে। সেইসাথে যোগ হয় খারাপ ফলাফলের গ্লানি। গায়ে এঁটে বসে 'খারাপ সন্তানের' তকমা। পরিবারও তাকে নিয়ে পড়ে বিড়ম্বনায়। খারাপ, ভীষণ খারাপ, ঐশী আত্মীয় স্বজনের আলোচনা-সমালোচনার উৎসুক্য বাড়ায়। পারিবারিক বিত্তের বাহূল্য সে উৎসাহ ঠেকাতে পারে না। ঐশী একটুখানি পলায়নের আশ্রয় খোঁজে। এই নাগরিক কংক্রিটের জঙ্গলের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা মাদকের নখ খুঁজে নেয় ঐশীকে। আপাত অসম্মানের জীবন থেকে ঐশী পালায় নেশার নীল দুনিয়ায়। যতক্ষণ নেশার ঘোর ততক্ষণ নিজের জগতে নিজেই রাণী। কেউ নেই তার দিকে অসম্মানের আঙ্গুল তোলার! এবারে ঐশী দূর্বিনীত হয়ে ওঠে। যে কোনো মূল্যে এই জীবনকে আর হারাতে রাজী না সে। পরিবারের সম্পর্ক, বন্ধন ততদিনে তার কাছে আলগা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ধুলো পড়ে গেছে সকল মূল্যবোধে। নিষ্পাপ কিশোরী হয়ে উঠেছে হিংস্র, চতুর ও ঘাতক। দীর্ঘদিন ধরে বাবা মাকে খুনের পরিকল্পনা করেছে সে। আগে দু একটি সুযোগ হারালেও শেষবারে খুব ঠান্ডা মাথায় সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। নেশার পথের কাঁটা বাবা মাকে কুপিয়ে খুন করেছে, গৃহকর্মীকে সাথে নিয়ে রক্তে ভেসে যাওয়া ঘর পরিস্কার করেছে, নিপুন ছল করে ভাই

আর গৃহকর্মীকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কি করে এতো কিছু করলো একটা কিশোরী কন্যা? বিস্ময় তো জাগেই, সবচেয়ে বেশি জাগে আতঙ্ক!

কেন, কিভাবে তৈরি হলো আজকের এই ঐশী? পিছনের কারণগুলো আমরা খতিয়ে দেখেছি কতটুকু? শিশু মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কোন শিশুই অবাধ্য, দূর্বিনীত, বখাটে, অশিষ্ট হয়ে জন্মায় না। আর সব বাবা মা-ই চান সন্তান ভালোভাবে মানুষ হয়ে উঠুক। তারপরও সন্তান বিপথে যায়, বখে যায়, নেশায় আসক্ত হয়, এমনকি সন্ত্রাসী- খুনি হয়ে ওঠে। কেন? এর কারণ খুঁজলে প্রতিটি বিপথগামী সন্তানের পেছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস পাওয়া যাবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিনগত ত্রুটি সন্তানকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। যেমন, লার্নিং ডিজএবিলিটি নিয়ে কোন শিশু জন্মালে এবং খুব শিশু অবস্থায় তা ধরা না পড়লে সমাজের চলমান স্রোতধারার সাথে সে তাল মিলাতে পারে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব শিশু অস্বাভাবিক আচরণ করে, একাকীত্বে ভোগে, একই সাথে এদের অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ার লক্ষণ থাকে। এটি প্রকৃতিগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের সন্তানের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম।

সন্তান মানুষ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বের দাবী রাখে তা হলো, অভিভাবকের সঠিক পরিচর্যা বা গুড প্যারেন্টিং। সারা বিশ্বে এসব নিয়ে নানা মাতম, মতান্তর আছে। তবে মোদ্দাকথা হলো- সন্তান মানুষ করতে হলে দূরত্বের বেড়া সরিয়ে বাবা-মা- কে সন্তানের বন্ধু হয়ে উঠতে হবে, ঘরকে করে তুলতে হবে আস্থা- নিরাপত্তা- ভালোবাসার আবাস। এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এর কতটা আমরা করতে পারছি? সন্তান বাবা মায়ের হাত ধরে প্রথম পথে বের হয়, বাবা মায়ের চোখ দিয়েই ভালো-মন্দ, সাদা-কালো, আদর্শ-পরিত্যাজ্য ইত্যাদি চিনতে শেখে। তাই এই পরিচর্যার ক্ষেত্রে খুব বেশি মনোযোগের দরকার। সত্যিকার অর্থে আমরা এর কতটুকু করতে পারছি? গৃহবন্দী শৈশবকে তথাকথিত নিয়মের বেড়াজালে বন্দী করে সকল কিছুতে প্রথম হওয়ার প্রানপণ দৌড়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। সারাক্ষণ পড়ো পড়ো করে জীবন অতিষ্ট করে তুলে, টিউশন- কোচিং- হোমওয়ার্কের চাপে চিড়ে চ্যাপ্টা করে কি বিকাশ আশা করছি আমরা?

সন্তানের এতটুকু পিছিয়ে পড়াকেও মেনে নিতে নারাজ আজকের বাবা-মা। অথচ এই পিছিয়ে পড়ার পিছনের কারণ খুঁজতে কতটুকু রাজি কারা এনিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়। শিশুর জন্যে পড়ার ক্লাস, আঁকার ক্লাস, গানের ক্লাস, নাচের ক্লাস সবখানেই প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা প্রথম হওয়ার, প্রতিযোগিতা বিত্তের, প্রতিযোগিতা গাড়ির মডেলের- ফ্লাটের ডেকরের-লেটেস্ট পোষাকের- পিএসপির.... আরও কতকিছুর। 'বেস্টফ্রেন্ড' আজ শুধু বন্ধু না, প্রধান প্রতিযোগীও বটে! কোথায় শিশুর দম ফেলার জায়গা? খেলা বলতে ভিডিও গেম, গান শোনা বলতে কানে গোঁজা হেডফোন। সন্তান বিচ্ছিন্ন বাবা মা থেকে, সমাজ থেকে, সকল রকম সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। কোথায় ছোটার মাঠ, খেলার দল? কার কাছে সে শিখবে অংশভাগিতা? যা আমরা হয়তো নিজের অজান্তে শৈশবে শিখেছিলাম দাড়িয়াবান্ধা বা ফুটবল খেলতে খেলতে। কারো একার জয় কেবলমাত্র তার একার নয়, বরং তা পুরো দলের। স্বার্থবাদিতার কোন স্থান ছিল না খেলার মাঠে। আজ কিউবিকল বন্দী শিশুরা শৈশবহারা, বড়ো একা। যেহেতু এই অবস্থা থেকে তড়িৎ কোন সমাধান সম্ভব না, তাই বাবা মাকে সন্তানের মন বুঝে তাকে নিবিড় সঙ্গ দেয়া একান্ত দরকার। সন্তানের সফলতা যেমন পুরো পরিবারের গৌরব, তেমন তার ব্যর্থতাকেও ভাগ করে নিতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ব্যর্থতার পিছনের কারণ। শুধুমাত্র দোষারোপ করে সমাধান আনা সম্ভব নয়। বাবা মাকে তাদের 'ইগো'র বলয় থেকে বের হয়ে সন্তানকে নির্ভেজাল সঙ্গ দেয়া খুবই জরুরি।

বলা হয়ে থাকে, পরিবারই শিশুর প্রথম পাঠশালা। তাই শিশুর গড়ে ওঠার পিছনে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ভূমিকা রয়েছে। সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা বাবা-মায়ের, বিশেষ করে মায়ের। কেননা শৈশবের প্রধান সময়টুকু সন্তান থাকে মায়ের সংস্পর্শে। সাধারণতঃ ১০ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে শিশুর আলাদা সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে

থাকে। এই সময়ে শিশু নিজের মতো করে, নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে বিশ্লেষণ করে। তাই এই সময়ে মিথ্যে কথা বা কোন কিছুর ভুল ব্যাখ্যা শিশুকে ব্যথিত করে, ভাবায়। এমনকি পরিবারের আয়ের উৎস, তার যৌক্তিকতা এবং নৈতিকতাও শিশু এ বয়সে বুঝতে পারে। পরিবারে অস্বাভাবিক বিত্তের আনাগোনা নিয়ে প্রশ্ন জাগলেও এ নিয়ে প্রশ্ন করার মুক্ত পরিবেশ না পেলে শিশু নিজের মতো করে এর ব্যাখ্যা দাঁড় করায় যা অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক হতে পারে। এর মাধ্যমে শিশু বিভ্রান্ত হতে পারে। তাই বাবা মা হয়তো যে বিত্তের বৈভবে সন্তানকে সুরক্ষিত রাখতে চান তা সন্তানের মনোজগতে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষত তৈরি করতে পারে। প্রয়োজনীয় জিনিসের আধিক্য অনেক সময়েই সন্তানের জন্য অপ্রয়োজনীয় অলংকারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বরঞ্চ কিছু কিছু অভাব বোধ শিশুকে বাস্তবমূখি হতে শেখায়। এ বিষয়টি বাবা মায়েরা ভেবে দেখতে পারেন।

আধুনিক প্রযুক্তি যেমন বর্তমান জীবনযাত্রাকে সহজতর করে দিয়েছে, তেমনি এর অতি ব্যবহার বা লাগামছাড়া ব্যবহার জীবনকে জটিলও করে তুলছে। জন্ম দিচ্ছে একই সাথে অহমিকাবোধ, হীনমন্যতা ও অসৎ প্রতিযোগিতার। প্রযুক্তির প্রয়োজন আজ অস্বীকার করার উপায় নাই, দরকারও নাই। কিন্তু ব্যবহারে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকুক না। সন্তানকে বুঝতে দিন ওর অধিকারের সীমা। বিশ্বময় রমরমা পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও পরিবারের মধ্যে আদর্শের চর্চা, সদস্যদের মধ্যে কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ অবশ্যই সমাধানের পথ দেখাবে।

একটা ১৫-১৬ বছরের ছেলে বা মেয়ে নেশায় আসক্ত হলে নেশা ছাড়ানোর জন্যে শুধুই শাসন না করে বরং নেশা করার কারণ খোঁজা জরুরি। একই সাথে জরুরি তার জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ চিকিৎসা। এক্ষেত্রে অতি শাসন এবং 'খারাপ ছেলে' বা 'নষ্ট মেয়ে'র তকমা গায়ে লাগিয়ে দেয়া সবচেয়ে মারাত্মক। এতে শিশু কিশোরের জীবনে ঘটিয়ে ফেলা আকস্মিক ভুল থেকে বের হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পরিবারের মূলস্রোত থেকে ছিটকে বিপথগামীতাকেই একমাত্র অবলম্বন বলে ধরে নেয় তারা। ছেলে বা মেয়ে নেশা করছে বলে শুধু পরিবারের সম্মান ধুলায় লুটিয়ে যাচ্ছে তাই না, ওর জীবনও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নেশার বিষয়টি লুকিয়ে, অতি শাসন করে, চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে সমাধান আসে না। বরং তা সবক্ষেত্রে না হলেও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মতো একজন ঐশী রহমান তৈরি করতে পারে। এইতো আমাদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন ধারার স্কুল নিয়ে, এসব স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে নানা সময়ে নানা আলোচনা, প্রতিবেদন আমরা দেখেছি। কিন্তু এনিয়ে কোন বাস্তবমূখি পদক্ষেপ কোনো সরকারই নেয় নি। আদতে এই স্কুলগুলিতে কি শিখছে শিক্ষার্থীরা? আমাদের সামাজ ও সংস্কৃতির সাথে তা এটি কতটুকুইবা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা অবশ্যই এই মূহূর্তের ভাববার বিষয়। অনেক নাম করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের আশেপাশেই গড়ে উঠেছে ড্রাগ জোন। এসবের সচিত্র প্রতিবেদন বিভিন্ন টেলিভিশনে প্রচারের পরও প্রশাসন শীতঘুমে। অভিজাত মহল্লার শীশা- ক্যাফে থেকে চেইন ফুড শপ...ক্যানাবিসের বিষে আর মিউজিকের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সদ্য উত্তীর্ণ কৈশোর। আমরা বোবা কালার মতো দেখছি। দোষ কি আমাদেরও নেই? কিছু নেই করণীয়?

এই সময়ের শিশুদের আত্মকেন্দ্রীক হয়ে বেড়ে ওঠার আরও একটি কারণ শিশু কিশোর সংগঠনের প্রায় অনুপস্থিতি। যেটুকুবা আছে তাও রাজনীতিকরণ বা বড়দের নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে মৃতপ্রায়। আশির দশকের মধ্য পর্যন্ত দেখেছি ঢাকাসহ সারাদেশে পাড়ায়, মহল্লায় খেলাঘর, মুকুলফৌজ, কচিকাঁচার মেলা, চাঁদের হাট, শাপলাকুঁড়ির মেলা এসব শিশু সংগঠনের শাখা ও আসর। নানা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এ সংগঠনগুলিতে চলতো সাংস্কৃতিক চর্চা, সাহিত্য বাসর, দেয়াল পত্রিকা আরও কতকিছু। এসব সংগঠনের সদস্য শিশু কিশোররা মেধা ও মননে দেশাত্ববোধ ও সুস্থ সংস্কৃতি ধারণ করে বেড়ে উঠতো। পাশাপাশি এক ধরণের সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি হতো তাদের। বড়ো হয়ে এইসব শিশু কিশোরাই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছে। এসব সংগঠনগুলিকে চাঙ্গা করে তোলা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

পরিবার ও সমাজ এই দুই জায়গাতেই আজ শৈশবের নিরাপত্তা, বিকশিত হওয়ার সুযোগ খুব দরকার। ভয় নয়, অসম্মান নয় বরং নিরাপদ ও আন্তরিক হোক শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ। ভরসা থাকুক, স্বস্তি থাকুক, ভালোবাসা থাকুক জীবনকে ঘিরে।

লেখক: বৃত্বা রায় দীপা- মানবাধিকার কর্মী ও চিত্রনির্মাতা।

বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য ও নারীর অধিকার

বাবুল চন্দ্র সূত্রধর

কোন সমাজের মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চের আঁধার সমাজ কাঠামো অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ সমাজের সংস্কৃতি ও সভ্যতাভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আদিম সাম্যবাদ, দাসযুগ, সামন্তযুগ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র- এগুলো মূলত এক একটি সমাজ কাঠামোর নাম; আর এসব নামের মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে সমাজগুলোর নিজ নিজ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। সমাজ কাঠামোর রূপায়নে আর্থ-সামাজিক উপাদান ছাড়াও ভৌগোলিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি উপাদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ কাঠামোয় উদ্ভাসিত প্রপঞ্চগুলো মানুষের সমাজ জীবন পরিচালনায় পাথেয়রূপে ক্রিয়াশীল থাকে। আমার বর্তমান ক্ষুদ্র নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ কন্যারা-মায়েরা সম্পর্কিত যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত রয়েছে, তাও ঐ কাঠামো-নির্ভর সংস্কৃতির অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি ঘটনা অনুধ্যানের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে চাই।

নাজনীন আক্তার। বয়স ১৪। গরীব মা-বাবার সন্তান। বাড়ির নিকটবর্তী রাস্তার পাশে বাবার চা-দোকানে সেও মাঝে মাঝে বসে। নারী মানবাধিকার বিষয়ক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নে গিয়ে রাজশাহীর তানোর উপজেলার এক নিভৃত গ্রামে নিজ দোকানে তার সাথে দেখা। ঐ এলাকার চার জন সহকর্মী আমার সঙ্গী ছিলেন। সে সূত্রেই পরিচয় ও আলাপ।

ঃ নামটা কি আপু?

- নাজু।

ঃ দোকান চালাও কবে থেকে?

- দোকান বাবা চালান। ভাত খেতে গেছেন, তাই বসেছি।

ঃ পড়াশুনা?

- জী, ক্লাস এইটে পড়ি।

ঃ তোমরা মেয়েরা মিলে নাকি গ্রামে সমিতি গঠন করেছ?

- জী।

ঃ সমিতির উদ্দেশ্য কি ?

- টাকা জমাই।

ঃ টাকা জমিয়ে কি করবে?

- মানে-

ঃ মানে, দেশে অনেক সমিতি আছে, যেগুলো সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কতকিছু করছে-জমি, বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা..... আমাদের অত টাকা তো নেই।

ঃ আমি শুধু তোমাদের সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য জানতে চাই-

- (মৃদু হেসে) দেখি কি হয়।

ঃ আচ্ছা, আমিই বলি। তোমাদের এলাকায় খুব কম বয়সে কন্যাশিশুদের বিয়ে হয়; তোমরা বোধ হয় বিয়ের জন্যে টাকা জমাচ্ছ?

চটপটে, ফুটফুটে, হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটির মুখমন্ডলে মুহূর্তেই দেখা দিল কালো মেঘের ঘনঘটা। রসিকতা করতে গিয়ে যেন খুব অসহায় হয়ে পড়লাম। নাজু কিন্তু দমবার পাত্রী নয়। আমার কথায় অকুণ্ঠ সায় দিয়ে সে বললঃ গরীবের সন্তান, তাও মেয়ে। সামান্য জমালে যদি মা-বাবার একটু সহায় হয়।

মেয়েটির কথা শুনে, মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে পারলাম না। শুধু মনে হল নাজুর লজ্জিত-ব্যথিত মুখমন্ডলে গোটা সমাজের ছবি ....।

এই যে মনো-সাংস্কৃতিক ধারণা ও বিশ্বাস তা হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া কোন সামাজিক প্রপঞ্চ নয়, বরং যুগ যুগ ধরে 'সম্প্রদায়' হিসেবে চিহ্নিত করে নারীকে অবদমিত করার অপপ্রয়াসের এক অনিবার্য পরিণতি, জেণ্ডার বৈষম্যরূপে যা বিবেচিত। সভ্যতার চরম উৎকর্ষের দাবীদার সমকালীন সমাজেও এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে দাবিয়ে রাখার প্রবণতা হতে মুক্ত নয়, বরং অভিনব তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে থাবা বিস্তারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। মানুষের চিরাচরিত প্রবৃত্তি অনুযায়ী নারী যখনই স্বীয় অস্তিত্বকে প্রমাণ করার, জানান দেওয়ার বা এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, তখনই তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে- তুমি নারী, তুমি অবলা। তবে আশার কথা এই যে, সমাজ প্রবাহে শুভবুদ্ধিরই বিজয় দেখতে পাওয়া যায়। বহু পরাক্রমশালী রাজবংশ, ধনিকতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভৃতির ক্ষয় হয়েছে, পতন হয়েছে, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়েছে। মহীয়ান নেতা আব্রাহাম লিঙ্কনের মানবতাবাদী দার্শনিক বক্তৃতা 'গেটিসবার্গ এড্রেস'-এর কাছে যেমন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরাজয় ঘটেছিল, মহীয়সী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের স্নেহ সেবার কাছে যেমন ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরাজয় ঘটেছিল, তেমনই মানবতার বার্তাবহ সকল উদ্যোগই একদিন আলোর মুখ দেখবে, জয়ী হবে- ইতিহাসের শিক্ষা এমনই। বেগম রোকেয়া, লীলাবতী নাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইলা মিত্র, বেগম শামসুন্নাহার, ফয়জুন্নেসা, বেগম সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম প্রমুখ বিপ্লবী-বিদূষী নারীরা অবশ্যই আমাদের গর্বের সম্পদ; তাঁদের চিন্তা ও কর্মকে পুঁজি করে শুধু নারীই তার অধিকার ও কর্তব্য অনুসন্ধানের প্রয়াস পায় না; বরং গোটা জাতিই অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, মানবসমাজে জেণ্ডার বৈষম্যের মত সুদীর্ঘ ইতিহাস আর কোন বৈষম্যের নেই। শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, যৌতুক, সহিংসতা, শিক্ষা-খাদ্য-বস্ত্রে বৈষম্য, কর্মসংস্থান ও মজুরীতে বৈষম্য, নাগরিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধা দান, মতামতের গুরুত্ব না দেওয়া, মতামত প্রকাশে বাধা দান, উত্যক্তকরণ প্রভৃতি নারী মানবাধিকার বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে বাংলাদেশে যে আইন-কানুনের খুব অপ্রতুলতা রয়েছে তা নয়। সমাজ বিশ্লেষক ড. বদিউল আলম মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন, "নারী-পুরুষের সমতা রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে রাখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বলিষ্ঠ বিধান। ... তবু দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।" [১] Violence Against Women and Children Act, The Dowry Prohibition Act, The Child Marriage Restraint Act, The Acid Crime Control Act প্রভৃতি নারী মানবাধিকার সংরক্ষণকারী আইন ও আইন লঙ্ঘনের তৎপরতা যুগপৎ ক্রিয়াশীল রয়েছে, যেন কাগজের কাজ কাগজে, সমাজের কাজ সমাজে।

আমাদের অবশ্য পালনীয় ও অনুসরণীয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধাচরণ করে সমতার পক্ষে জোরালো অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত কতিপয় ধারা-উপধারা উদ্ধৃত করে অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, "... বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম অধিকার এবং নারীর পূর্ণ মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার অধিকার বিষয়ে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। সংবিধান সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখার শপথ নিয়ে যারা রাষ্ট্র ও সরকারি ক্ষমতায় বসেন, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তারা শপথ রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত হতে পারেন।" বস্তুত: [২] 'ultimate protector of citizens from any sort of discrimination' হিসেবে সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ব্যতীত এক্ষেত্রে কার্যকর অগ্রগতি অর্জন অসম্ভব।

তবে রাষ্ট্রীয় আইন সর্বাংশে নারীর অধিকারকে সুসংহত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, একথাও অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষত: পারিবারিক উত্তরাধিকার তথা ভূ-সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের ব্যাপারে আইনের ভূমিকা সীমিত। তদুপরি, আইনের মাধ্যমে যে স্বল্প অধিকার নারীরা পান, সমাজ তা হরণ করে। অধ্যাপক আবুল বারকাত তাই বলেন, "জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আইনগতভাবে সীমিত, আর বাস্তবে নেই বললেই চলে। নারীর ক্ষমতায়নে এ এক অন্যতম বাধা। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক প্রথা- এ সবই নারীর প্রতি বৈষম্য চিরস্থায়ীকরণের অন্যতম মাধ্যম। এ দেশে নারীর উত্তরাধিকার আইন ধর্মভিত্তিক "পার্সোনেল ল" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত-মুসলিম ধর্মের নারীর ক্ষেত্রে শরিয়া আইন, আর হিন্দু ধর্মের নারীর ক্ষেত্রে দায়ভাগ আইন। শরিয়া আইনে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার সীমিত-স্বীকৃত, আর দায়ভাগ আইনে নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। বাস্তবে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার আসলে কার্যকরী নয়। মুসলিম আইনে সীমিত-স্বীকৃতি থাকলেও এ দেশে মুসলিম নারী সম্পত্তির মালিকানা অধিকার থেকে কার্যত: বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে "গুড সিস্টার" কনসেপ্টটি পুরোপুরি কাজ করে। "গুড ব্রাদার" মূল্যবোধ অন্তত: সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে কাজ করে না। একদিকে পিতৃতান্ত্রিকতা আর অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র্য-উভয়ই সম্ভবত এ অবস্থা জিইয়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে। যে কারণে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আর মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যমূলক ধারণাগুলি সংশোধনের জন্য প্রগতিশীল নারী আন্দোলনসহ সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজ এখন যথেষ্ট মাত্রায় সোচ্চার।" রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন ১৯৫০-এ পরিবারের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাও বর্ণিত বক্তব্যকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করে- "একটি পরিবারের কোন কন্যা পিতা-মাতা হতে পৃথকভাবে বসবাস করলে তাকে তার পরিবারের প্রধান হিসেবে ধরা হবে না। এমনকি সেটি পরিবার হিসেবে বিবেচিত হবে না। পুত্রের পৃথক বাসস্থান পৃথক পরিবার হিসেবে বিবেচিত হবে।" আইনের মাধ্যমে নারীর অধস্তনতাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা এখানে সুস্পষ্ট।

বস্তুত নারীকে অবদমনের বিষয়টি আমাদের সমাজদেহে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, যেন এটা সমাজের অবধারিত নিয়তি। নাইবা হবে কেন? সামাজিক সংগঠনের মৌলিক একক ও শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন পরিবার হতেই বৈষম্যের সূত্রপাত। পারিবারিক পরিমণ্ডলে সৃষ্ঠ বৈষম্য প্রসঙ্গে আইন বিশেষজ্ঞ সালমা আলীর বক্তব্যটি অত্যন্ত মর্মস্পশী- "পারিবারিক সংস্কৃতি যেখান থেকে শিশু প্রথম শিক্ষালাভ করে, সেখানে কন্যারা জীবনের শুরুতেই উপলব্ধি করে যে, পরিবারে তার মায়ের অবস্থান বাবার মত নয়, বোনের অবস্থান ভাইয়ের মত নয়, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। পরবর্তীতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ ফারাক আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়। এ অবস্থায় কন্যাদের মধ্যে জন্ম থেকেই তৈরি হয় বৈষম্যের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করার এক অভ্যস্ত গণ্ডি। ফলে অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তারা এ বৈষম্যকে মেনে নেয়।" নতুবা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, যে লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার কথা ভাববে আনন্দে-নিষ্ঠায়, সে কিনা নিজের বিয়ের জন্যে টাকা সঞ্চয় করে! কী লজ্জা!

সমাজকর্মে-রাষ্ট্রশাসনে নারীকে মূল্যায়ন করার প্রাচীন নির্দেশনা ও প্রেরণা অনেক সমৃদ্ধ, যার সুনিপুণ বর্ণনা পাই 'রিপাবলিক'-এ। মানবসভ্যতার আদি গুরু প্লেটো তাঁর সর্বজননন্দিত উক্ত গ্রন্থে বলেন, "নারী ও পুরুষের মধ্যে যে-ই কোন বিশেষ কর্মক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করবে, তাকেই উক্ত কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত করা উচিত। বস্তুত, নারীর স্বভাবে এমন কোন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না, যার দরুন আমরা বলতে পারি যে তারা শাসনকর্মের অনুপযুক্ত। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারেও এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে নারী ও পুরুষ নিরঙ্কুশভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে। নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল তা মানি, তবু স্বাভাবিক গুণ বলতে যা বুঝায়, তা উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। এজন্যেই আমি বলতে চাই যে, সকল প্রকার কর্মক্ষেত্রে উভয়েরই সমান প্রবেশাধিকার আছে।" প্রাচ্যদেশীয় সমাজ-দার্শনিক কনফুসিয়াস ও কৌটিল্যের সুলিখিত রচনাবলীতেও নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাঙ্ক খুঁজে পাওয়া যায় না বরং সমন্বয়-নির্ভর মানবতাবাদের আলোকোজ্জ্বল তাত্ত্বিক দিক-নির্দেশনাই পাওয়া যায়।

আদি হতে বর্তমান- শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্ম হয়ে কেন আইনের সাক্ষাৎ উপস্থিতি থাকা সত্বেও নারী মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে তার ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক কারণগুলো মূল্যবোধ-নিরপেক্ষভাবে উদঘাটন করতে হবে, একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি পূনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, উন্নয়নের যেকোন প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় মৌলনীতির ধারা অকুণ্ঠভাবে সমর্থিত না হলে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশংকা থাকা স্বাভাবিক। নারীর প্রতি বৈষম্যকে বিশেষ সামাজিক সমস্যারূপে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং নারী ও পুরুষকে সমভাবে এর পক্ষে কাজ করে যেতে হবে। নারী মানবাধিকারের সূচকগুলো চিহ্নিত করে একটা কালপঞ্জি তৈরি করতে হবে, যেখানে কোনটা কবে, কিভাবে বাস্ত বায়ন বা অর্জন করা সম্ভব, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপর্বে কোন বিষয়টি কি কি কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলো না, তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে। তবে এক্ষেত্রে স্নেহ-মমতা ও পারস্পরিক বুঝাপড়ার পীঠস্থান পরিবারকে মূল ভিত্তিরূপে শিরোধার্য করে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করলে তা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে অবশ্যই নারী প্রতিনিধিদের মতামতকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। কারণ স্বাজাত্য চেতনা এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী বিষয়। মনো-সাংস্কৃতিক ধারণার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত কন্যাশিশু যথার্থ মানবশিশু হিসেবে সমাজে বেড়ে ওঠতে পারে না। বিবেচনায় রাখা অত্যাবশ্যক যে, বিদ্যমান অবস্থায় একটি কন্যাশিশু ক্রমপরিণত হয়ে বোন, স্ত্রী ও মা সর্বোপরি নারী হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে

ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, তা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কি? সমাজের অর্ধেক অংশ নারীকে অবজ্ঞা করে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা লক্ষ্য অর্জনে সফলতা পেতে পারে না; তাই নারীর বঞ্চনা মানে সমাজের বঞ্চনা।

মনোজাগতিক ধারণাকে মাথায় রেখে বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহে নারীকে যথাযথ মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। এ উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত চক্রটিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে বলে মনে করি।

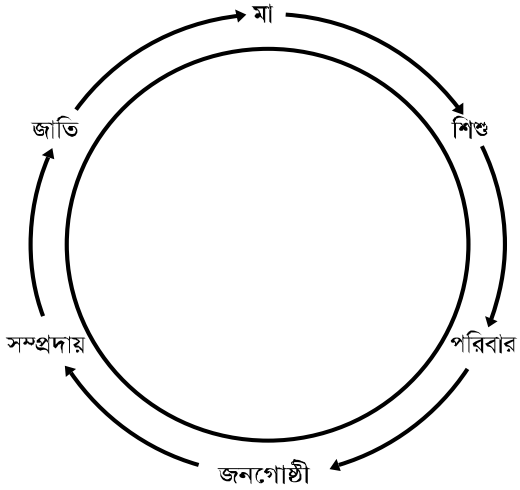

চক্রটি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে যে সামাজিক চিত্র পাওয়া যাবে,তা হলো-সুস্থ মা সুস্থ শিশুর নিয়ন্তা, সুস্থ শিশু সুস্থ পরিবারের আকর, সুস্থ পরিবার সুস্থ জনগোষ্ঠীর নির্ধারক, সুস্থ জনগোষ্ঠী সুস্থ জনসম্প্রদায়ের নিয়ামক আর সুস্থ জনসম্প্রদায় সুস্থ জাতির পূর্বশর্ত; আবার সুস্থ জাতিই নিশ্চিত করতে পারে সুস্থ মা'র সামাজিক অস্তিত্ব। চক্রটিকে বিপরীতভাবে ব্যাখ্যা করলে নেতিবাচক উপাদানসমূহের সমাবেশ ঘটবে।

তাই পরিশেষে এটুকুই বলতে চাই যে, যেসব নীতি-নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা ও প্রচেষ্টা-প্রবণতা বর্তমান বাংলাদেশের সমাজকাঠামোয় পরিদৃষ্ট হচ্ছে, সেসবের কার্যকর পরিমার্জন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কন্যাশিশু ও নারীর সামাজিক মূল্যায়নের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে হবে। মানবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য জাতি গঠনের স্বার্থে এমন এক আত্মবোধ সমাজের প্রতি স্তরে বিকশিত করে তুলতে হবে, যা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছিল অনেক আগেই।

"যে দেশে নারীরা বন্দিনী আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয়!
অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য-শক্তিহীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ!"

লেখক: বাবুল চন্দ্র সূত্রধর, মানবাধিকারকর্মী ও গবেষক।

শিশুবিবাহ বন্ধে প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা

বিপ্লবী রানী দে রায়

অপরিণত বয়সে অর্থাৎ ১৮ বছরের নীচে কন্যাশিশুদের এবং ২১ বছরের নীচে ছেলেদের যদি কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনই তাকে শিশুবিবাহ বলা হয়। শিশুবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি এবং নারী উন্নয়নের প্রধান অন্ত রায়। এটি শিশু অধিকারের লঙ্ঘনও বটে। এটি কন্যাশিশুদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, বিকাশের জীবন থেকে ঝরে পড়ে এবং প্রবেশ করে এক বন্দী জীবনে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশে এখনও অনেক অভিভাবক আছেন যারা এই বিয়ের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন নন। অনেকে কিছুটা জানলেও সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে চলেন।

জাতীয় শিশুবিবাহ জরিপ-২০১২ অনুযায়ী, বাংলাদশে বর্তমানে ৬৪ শতাংশ কন্যাশিশু শিশুবিবাহের শিকার। গ্রামাঞ্চলে এই হার আরও বেশি। শিশুবিবাহের ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের গড় বয়স হলো ১৫ বছর। ৩২ শতাংশ কন্যাশিশুর বিয়ে হয় ১৫ বছর বয়সের মধ্যে এবং ৬৬% কন্যাশিশুর বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সের মধ্যে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে শিশুবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি। এই শিশুবিবাহের কারণ হলো- নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ঐতিহ্যগত প্রথা, যৌতুক এবং ইভটিজিং ইত্যাদি। এই বিয়ের ফলে কিশোরী কন্যাশিশুরা অল্প বয়সে মা হয়। যে কারণে মা ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়, অনেক সময় মারা যায়। অপুষ্ট ও কম ওজনের শিশুর জন্ম হয়, শিশু শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধি হয়। শিশুবিবাহের আরেকটি অন্যতম ক্ষতি হলো- কিশোরী কন্যাশিশুরা স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ে। ফলে তারা অনেক তথ্য জানে না, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত অনেক তথ্য তাদের অজানা থাকে। যে কারণে তারা নিজের ও শিশুর জীবনের সঠিক যত্ন নিতে পারে না। সর্বপরি এটি জাতির জন্য একটি অভিশাপ বয়ে আনে।

শিশুবিবাহ বন্ধ করতে হলে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার প্রচারণা। যাতে করে সমাজের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া যায়। এই কাজের জন্য প্রয়োজন একটু আগ্রহ, একটু সদিচ্ছা। শিশুবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা শিশু, নারী-পুরুষ, মা-বাবা, পরিবার, সমাজ, স্থানীয় সরকার, উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এ সংস্থার রয়েছে শিশু সুরক্ষা দল। এই দলটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যেক দলে রয়েছে ১৭ থেকে ২১ জন সদস্য। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবী লোকের সমন্বয়ে এটি গঠিত। যেমন: শিশু, নারী, পুরুষ, শিক্ষক এবং নাগরিক সমাজের সদস্য।

এই দলের প্রত্যেক সদস্য শিশুবিবাহ বন্ধের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুবিবাহের কোন খবর শুনলে তারা প্রথমে নিজের মধ্যে আলোচনা করে কৌশল ঠিক করে। প্রথমে তারা বিয়ের কনে ও পরিবারের সাথে আলোচনা করে এবং শিশুবিবাহের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে। তারপর তারা শিশুবিবাহ বন্ধে সরকারের যে

আইন ও শাস্তির বিধান রয়েছে তা তুলে ধরে। এতেও যদি পরিবারাটি বিয়ে বন্ধ করতে রাজি না হয়, তখন তারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানায়। চেয়ারম্যান বিষয়টিকে নিজের হাতে তুলে নেয়, পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে, পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে। শিশুবিবাহের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে, শিশুবিবাহ বন্ধে সরকারের যে আইন ও শাস্তির বিধান রয়েছে সেই সকল দিক তুলে ধরে। এইভাবে চেয়ারম্যানের মাধ্যমে অনেক বিয়ে বন্ধ হয়। আর যেখানে চেয়ারম্যান বিয়ে বন্ধ করতে ব্যর্থ হন, সেখানে তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এইভাবে কাজ করার ফলে শিশুবিবাহ বন্ধের হার পূর্বের চেয়ে অনেকটা কমেছে। তারপরও মানুষ পুরোপুরি সচেতন হয় নি। এখনো কিছু কিছু অভিভাবক এই সকল পদক্ষেপ উপেক্ষা করে, নিজের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন না করে, পার্শ্ববর্তী উপজেলা বা ইউনিয়নে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন করে, যেখানে শিশু সুরক্ষা দল নেই। অনেকে আবার নোটারী পাবলিকের সহায়তায় জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে বিয়ের ব্যবস্থা করে। অথচ অভিভাবক হয়ে নিজেরাও জানে না, তারা তাদের কন্যাশিশুর জীবনে কি সর্বনাশ ডেকে আনল।

সত্যিই এটি একটি দুঃখজনক অবস্থা! এর জন্য দায়ী কে? কে পারে এই অবস্থার পরিবর্তন করে কিশোরী কন্যাশিশুদের শিক্ষিত করে, একটি উন্নত জাতি গড়তে? সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ যখন সচেতন হবে, শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে, তখনই এই মরণ ফাঁদ নামক সামাজিক ব্যাধি শিশুবিবাহ দূর হবে।

শিশুবিবাহ বন্ধের জন্য স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনিয়ন পরিষদ যদি প্রত্যেক ওয়ার্ডে 'শিশুবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করে তাহলে এই বিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল শিশুবিবাহ বন্ধ এবং কন্যাশিশুদের মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য 'যেহেতু আমি একজন কন্যাশিশু' এই শিরোনামে সারা বিশ্বব্যাপী একটি প্রচারণা পরিচালনা করে আসছে। এই প্রচারনার মূল লক্ষ্য হলো কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন করা। এটি তৃনমূল পর্যায়ে বিশেষ করে গ্রাম, গ্রামের স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে বিভিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রচারণার মূল কাজ হলো: স্বাক্ষর সংগ্রহ, হাত উত্তোলন করে সর্মথন দান এবং আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল এই প্রচারণার মাধ্যমে এক মিলিয়নের অধিক হাত উত্তোলনের ছবি তুলেছে এবং এই কার্যক্রমটি চলমান আছে। প্রচারনা শেষে এই ছবিগুলো জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের কাছে হস্তান্তর করবে। শিশুবিবাহ বন্ধ এবং কন্যাশিশু শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল একটি নেতৃত্ব দানকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে এর পরিধি অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং সুনাম অর্জন করেছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯ সাল অনুযায়ী, শিশুবিবাহের শাস্তি হলো- এক মাসের জেল এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। যা বর্তমান সময়োপযোগি নয়। সরকারের উচিত এই শাস্তি কঠোরতর করা; যাতে করে মানুষ শাস্তির ভয়ে শিশুবিবাহ থেকে বিরত থাকে।

শিশুবিবাহ বন্ধের জন্য প্রয়োজন চারটি স্তরে বিশেষ সহযোগিতা। যেমন ঃ পরিবার, সমাজ, স্থানীয় সরকার এবং সরকার। এই স্তরগুলো যদি যার যার নিজেদের জায়গা থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কন্যাশিশুদের শিক্ষিত করে, নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে তাহলেই শিশুবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব। আসুন, আমরা শিশুবিবাহ প্রতিরোধ করি, নারী শিক্ষা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি - এই হোক আমাদের আগামী দিনের অঙ্গীকার।

লেখক: বিপ্লবী রানী দে রায়, কমিউনিকেশন্স কোর্ডিনেটর-প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, গাজীপুর প্রোগ্রাম ইউনিট।

একজন সুপ্তীর কথা

বিলকিস নাহার

ছোট্ট সুপ্তী। চার ভাই-বোনের মধ্যে পরিবারের একমাত্র ছোট মেয়ে। সকলে বলাবলি করে মা-বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে সুপ্তী। মা-বাবাও স্বীকার করে তিন ছেলের পরে একমাত্র আদরের মেয়ে। মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করে। কিন্তু বাঁধ সাধে সমান ভাগাভাগির ক্ষেত্রে। বড় মাছ-মাংসের টুকরো বা নতুন কাপড়-চোপড়ের বেলায় আর আদর-সোহাগ সমান হয় না। সেখানে ছেলে সন্তানদেরই অধিকার বেশি। একটি জামা থাকলেও আরেকটি নতুন জামা ভাগ্যে জোটে না সুপ্তীর। বড় ভাইদের পুরানো বই-খাতা দিয়েই পড়াশুনা চালিয়ে নিতে হয় তাকে। প্রাইভেট পড়ার ক্ষেত্রেও সকলের একই কথা- মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য এতো টাকা-পয়সা খরচ করার দরকার নেই। কিন্তু লেখাপড়ায় ভাল ফলাফল করার জন্য সুপ্তী প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যায়। এরফলে স্কুলের বার্ষিক ফলাফল ঘোষণায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতে ভাই ও মা-বাবা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও মনে মনে বিষয়টি মেনে নিতে পারে না। ছেলেদের পিছনেই বেশি টাকা-পয়সা খরচ করার পরও মেয়েটিই ভাল ফলাফল করছে। এতে বাবা-মা উৎসাহ পান না।

সংসারের কাজে মাকে সহযোগিতা করেই সুপ্তীকে লেখাপড়ার সময় বেছে নিতে হয় এবং স্কুলে যেতে হয়। স্কুল থেকে এসে আবার মাকে সংসারের কাজে সহযোগিতা করে। রাত জেগে পড়তে চাইলে হারিকেনের তেল বেশি না পোড়ানোর ভয় আছে। কারণ ভাইদের যদি রাত জেগে পড়ার দরকার হয়। তখন তেল না থাকলে তারা পড়ালেখা করবে কি করে! এভাবেই সংসারের একমাত্র মেয়ে হয়েও অনাদর অবহেলায় বেড়ে ওঠতে থাকে সুপ্তী।

এক সময় ছোট্ট সুপ্তী থেকে পরিণত হয় কিশোরী সুপ্তীতে। এ সময় সে একই গ্রামের আবীর নামের একটি ছেলেকে মনে মনে ভালবেসে ফেলে। একদিন তা দু'জন দু'জনের নিকট প্রকাশও করে। সুপ্তী তার ভালবাসার মানুষটিকে জানায়, তার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে কোনোভাবেই বিয়ে করবে না। যে করেই হোক মা-বাবাকে বুঝিয়ে শিশুবিবাহ থেকে সে বিরত থাকবে। কেননা তাদের স্কুলে সমাজ বিজ্ঞানের ম্যাডাম শিশুবিবাহের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেছেন। সেটি সে মানতে চায়। তাই জেনেশুনে নিজের জীবনে এ অভিশাপ সে বয়ে আনতে দেবে না। ছেলেটিও জানায় যে, আমরা দু'জনে লেখাপড়া করবো। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করার পর তোমাকে বিয়ে করে পরম শান্তিতে জীবন কাটাবো।

এই আশায় বুক বেঁধে সুপ্তি মাকে সংসারের কাজে আরও বেশি বেশি সহযোগিতা করা ও লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হয়। সে বছর পরীক্ষায় সুপ্তী আরও ভাল ফলাফল অর্জন করে। বাবা-মা কোনভাবেই খুশী হতে পারে না। মেয়ে পড়ালেখা ভাল করলে তার জন্যতো বেশি খরচ করন লাগবো। ছেলেগো পেছনে এতো খরচ করি, তারপরও তারা বালা খবর শোনায় না। এ পোড়া কানে ছেলেগো বালা খবর শোনার ভাগ্য আমাগো কপালে নেই।

নাই! মেয়েকে আর বাড়তে দেওন যায় না। তাছাড়া মেয়েকে তো বিয়ে দিতেই অইবো। তাই সময় থাকতে অল্প বয়সেই বিয়ে দিলে যৌতুকের টাকাও কম দিলেই চইলবো। আবার মেয়ে কখন কোথায় কি করে বসে তার কি কোন ঠিক আছে? মেয়েকে শিক্ষিত করলে সমাজের লোকেরা ভালো চোখে দেহে না। ঘটকের সাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ভাল সম্বন্ধের ব্যাপারে কথা কওন লাববো।

অষ্টম শ্রেণী থেকে সবার চেয়ে ভাল ফলাফল করে সুপ্তী যখন নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হবে তখন বাবা জানালেন মেয়ের লেখাপড়ার পেছনে টাকা খরচ করা আর ছাইয়ে পানি দেয়া একই কথা। সুপ্তির মাকে জানিয়ে দেয়, পোলারা যহন লেহাপড়া করতে পারলো না তহন মাইয়ারে পড়ায়ে আর কি লাভ অইবো। মেয়েকে জানিয়ে দিও তার আর স্কুলে যাওনের দরকার নাই। বাড়ীর বাইরে যেন না যায় সেদিকে খেয়াল রাইখো। দুই এক দিনের মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ আইবো। ছেলেরা লেহাপড়া না করলে খ্যাত-খামারের কাজ করবো, বিয়ে করে দাসী আনবো। তারা তোমার সংসারের কাজে সাহায্য করবো।

লাল কাঁথান শাড়ী পড়ে কনের বেশে বরের সাথে যখন সুপ্তী শ্বশুর বাড়ীর পথে পা বাড়ায়, তখন সে পারে নাই ম্যাডামের কাছ থেকে শেখা শিশুবিবাহের ক্ষতিকর দিক ধরে তুলে মা-বাবাকে বোঝাতে। তার সমাজের কোন হাতিয়ারই হাতে নাই যে তার ভালবাসার মানুষটিকে রক্ষা করবে। কেউ জানতেও পারলো না দু'টি প্রাণীর বুকে কি ক্ষত হয়ে রইলো, আর এ ক্ষতের কি ব্যথা।

ছয় মাস যেতে না যেতেই সুপ্তী শ্বশুর বাড়ির সকলের কাছে চক্ষশূল হতে থাকে। সংসারের সকল কাজ করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়। শ্বাশুড়ি সংসারের কাজে তাকে সহায়তা না করে পাড়ায় পাড়ায় গল্প করে, ঘরে শিক্ষিত বউ এনেছি। যেমন শিক্ষিত তেমন কাজকাম করে। অন্যদিকে সুপ্তীর স্বামী জানায়, ঠিকমতো সংসারের কাজ করতে না পারলে বাপের বাড়ী চলে যাও, আমি আরেকটি সুন্দর দেখে বউ বিয়ে করে নিয়ে আসবো।

সুপ্তীর শরীর না চললেও শরীরের ওপর জোর খাঁটিয়ে সকলের মন জোগানোর জন্য সব ধরনের কাজ করার চেষ্টা করে। অনেক সময় পুকুর ঘাটে পানি আনতে গিয়ে পড়ে যায়, আবার ভারী কলসি ওঠাতে না পারলেও অল্প অল্প করে বার বার পানি নিয়ে এসে কাজ সেরে নেয়। এভাবেই কিশোরী বউ সুপ্তী শ্বশুর বাড়ির ঘানি টানতে থাকে।

একদিন প্রচণ্ড রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে সুপ্তী। আর কাজে হাত দিতে পারে না। তার স্বামী ডাক্তার ডাকতে চাইলে শ্বাশুড়ী বলে যে, যাদের মেয়ে, তারাই চিকিৎসার টাকা খরচ করবে। এখানে রেখে চিকিৎসা করালে সকল খরচ আমাদের দিতে হবে। তার থেকে বাপের বাড়িতে রেখে আয়। মায়ের কথামত তার স্বামী তাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসে। কিছুদিন পর স্বামীর কাছে খবর আসে সুপ্তীর অবস্থা মোটেই ভাল না, সে যেন তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়িতে আসে। স্বামী তার মাকে বিষয়টি জানালে মা বলে যে, আগে আমি যাচ্ছি, তারপর তোকে পাঠাবো। শাশুড়ী সুপ্তীদের বাড়িতে যখন পৌঁছে, তখন সুপ্তীকে থানার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন। শাশুড়ী সুপ্তীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাতে বাধা দেন। বলেন, আমার ছেলের বউ সদরে পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাবে, এতে আমার বংশের সম্মান রক্ষা হবে না। ভ্যান থেকে শাশুড়ী সুপ্তীকে ঘরে টেনে নিয়ে যায়। চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়ায় সুপ্তীর অবস্থা ক্রমান্বয়েই খারাপের দিকে যেতে থাকে। সুপ্তীর মা তার বাবাকে ডেকে বলে- আমার মেয়ের এ অবস্থা আমি আর সইতে পারছি না। তোমরা সদরে নিয়ে না গেলে অন্তত একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসো। সুপ্তীর ভাইয়েরা সদর থেকে যখন ডাক্তার নিয়ে আসে তখন সুপ্তী ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। শাশুড়ী চিৎকার দিয়ে বলে- আমি জানতাম আমার ঘর আলো করে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে আমার বউমা। সুপ্তীর মা ঘরে ঢোকে দেখে ফুলের মতো ফুটফুটে একটি নিথর দেহ পড়ে আছে সুপ্তীর পাশে। মা বলে- ছেলে কাঁদছে না, নড়াচড়াও করছে না। শাশুড়ী ভাল করে দেখে তার বউমা একটি মৃত পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছে। তিনি আর অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দেন। বাড়িতে ফিরে

ছেলেকে জানান, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আবার নতুন বউ ঘরে আনবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বউকে তালাক দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুপ্তীর বাবা-মা সদর থেকে একজন ডাক্তার ডেকে আনেন। ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখে বলে এখনই এ অবস্থায় সুপ্তীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে, তা না হলে রোগীকেও বাঁচানো যাবে না। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুপ্তীকে শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সুপ্তী এ যাত্রায় ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকে। এর কিছুদিন পর আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় সুপ্তী ঢাকায় আসে। একজন গাইনী বিশেষজ্ঞ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বলেন, যে ধাত্রীর হাতে তাকে প্রসব করানো হয়েছে সে জোরপূর্বক জরায়ুর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চাপ খাটিয়ে বাচ্চা বের করে এনেছে, এ কারণে তার জরায়ু উল্টে গেছে। বাঁচ্চাটি পেটে থাকতেই হয়তো কোন একদিন সুপ্তী মাটিতে পড়ে যায়; যে কারণে পেটের ভেতরে বাচ্চার স্বাভাবিক অবস্থান নষ্ট হয়। তিনি আরও বলেন, জোরপূর্বক প্রসব করানোর কারণে জরায়ুর ভিতরে যন্ত্রণার কারণ হয়ে থাকবে, তাই অপারেশন করে কেটে ফেলে দিলে সুপ্তী হয়তো বাকী জীবনটা সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

সুপ্তীর মা তাকে সাবধান করে দেয়, যাতে গ্রামে ফিরে গিয়ে তার মা হওয়ার সুযোগ না থাকার বিষয়টি কাউকে না জানায়। সুপ্তী তার মাকে গ্রামে চলে যাওয়ার অনুরোধ করে। বলে, আমি ডাক্তার আফাকে বলে আর কয়ডা দিন ঢাকা থাইকা যাই। ডাক্তার আফাকে বুজাইয়া কইলে সে আমার কথা শোইনবো। তুমি কোন চিন্তা কইরো না। বাজানেরে শুধু বুজাইবা যে, ডাক্তার আফা আমারে চিকিৎসার জন্য আরও কিছুদিনের জন্য তার কাছে রাইখা দিছে্।

ডাক্তারকে সুপ্তী তার অতীত জীবনের সবকিছু খুলে বলে। ডাক্তার আপা তার কথা সব কথা শুনে খুব মর্মাহত হন। তিনি সুপ্তীকে একটি আবাসিক স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে (বিজ্ঞান বিভাগ) ভর্তি করে) দেন। এর মাধ্যমে সুপ্তী ফিরে পায় তার হারিয়ে যাওয়া কৈশোর। ডাক্তার আপা তার সব খোঁজ-খবর রাখেন এবং সব ধরনের ব্যবস্থা করে দেন। সুপ্তীও নীল আকাশে পাখীর মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। জীবনে অনেক বড় হবার স্বপ্নের রাজ্যে প্রজাপ্রতি হয়ে এ ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে যায়। আর মনে মনে তার ভালবাসার মানুষটিকে খুঁজে ফিরে। কি করে তার সন্ধান পাবে আর পেলেও কিভাবে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? সে তো তার জীবনের মূল্যবান সম্পদটিকে হারিয়েছে। কিন্তু সুপ্তীর ভিতরের সুপ্ত বাসনা মাথা চাড়া দেয় যে, তার ভিতরের সুপ্ত বাসনা তো হারায়নি। সে যে একজন মানুষ, এটিকে তো সে হারায়নি। এই মানুষটিকে সে সম্পদে পরিণত করবে বলে নিজের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

ডাক্তারের সহমর্মিতা, সহযোগিতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও নিজের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে সুপ্তী একদিন ভালভাবে নার্সিং পাশ করে একটি বড় হাসপাতালের শিশু বিভাগে চাকরি নেয়। অসুস্থ শিশুদের সুস্থ করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সুপ্তী দুনিয়ার সকল সুখ পায়। এভাবেই চলতে থাকে সুপ্তীর বেঁচে থাকার দিনগুলো। মা-বাবার খোঁজ-খবর রাখে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও টাকা পয়সা পাঠিয়ে দেয়। ভাইদেরও যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করে। সুপ্তীর মা-বাবা তাদের ভুল বুঝতে পারে যে, ছেলেদেরকে যেভাবে মানুষ করেছি, সুযোগটুকু যদি আমাদের সুপ্তীর বেলায় দিতাম তাহলে সুপ্তী জীবনে আরও অনেক ভাল কিছু করতে পারতো। সুপ্তীর প্রতি যে অবিচার আমরা করেছি তা আর কোনদিন আমরা শত চেষ্টা করলেও শোধরাতে পারবো না।

এর মধ্যে বেশ কিছু বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। সুপ্তীর বন্ধু আবীরদের গ্রামে সরকারিভাবে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। আবীর এমবিবিএস পাশ করে বিসিএস ক্যাডার হয়ে তার গ্রামের হাসপাতালে যোগদান করে। পাশাপাশি একটি বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে সরকারি সেবার পাশাপাশি তাদের এলাকাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিশুবিবাহ রোধ ইত্যাদি গণসচেতনা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। তিন

বছরের মধ্যে আবীরের প্রচেষ্টায় একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে তার গ্রামে একটি স্কুল ও আরও ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়।

একদিন আবীর সুপ্তীদের বাড়িতে তার বাবা-মায়ের কাছে সুপ্তীর শ্বশুর বাড়ি ও সন্তানদের ব্যাপারে জানতে চায়। সুপ্তীর মা আবীরের দিকে ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এক সময় তার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে যায়। আবীর চাচীকে ঝাঁকি দিয়ে বলে কথা বলছেন না ক্যান চাচী। সুপ্তীর কথা আমাকে বলেন। চাচী চোখের জল মুছে আবীরকে আলাদা করে একা একা বলেন, বাবা তুমি এহন বড় ডাক্তার তোমাকে সব বলা যায়। তয় আমি তোমাকে যা বলবো তা তুমি কাউকে কইবা না। তারপর সুপ্তীর কথা তাকে সব খুলে বলেন।

আবীর সবকিছুকে উপেক্ষা করে সুপ্তীর কাছে পৌঁছায় এক বিকালে। আবীরকে দেখে সে ভাবে স্বপ্ন দেখছে না তো? সুপ্তি কিছু বলার আগেই আবীর বলে, আমি সবকিছু জেনেশুনেই এখানে এসেছি। আগামী সপ্তাহে আমাদের গ্রামের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটির শুভ উদ্বোধন। চলো, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি আমার পাশে থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটির হাল ধরবে।

লেখক: বিলকিস নাহার, টেকনিক্যাল অফিসার, গার্লস পাওয়ার প্রকল্প, অপরাজেয় বাংলাদেশ।

কন্যাশিশু ও নারীঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ আহছান জাকির মিঠু

সেদিন একটি অনলাইনে দৈনিক পত্রিকা পড়তে পড়তে চোখ পড়ে একটি চমকপ্রদ সংবাদের দিকে। রাশিয়ার এক নারী গর্ভধারন করেছেন ২৭ বার, ১৬ বার দু'টি করে, ৭ বার ৩টি করে এবং ৪ বার ৪টি করে সন্তান প্রসব করেছেন। ৬৯টি সন্তানের মধ্যে ৬৭টি সন্তান জীবিত আছে। দম্পতিদের ছবি দেখলাম, সকলে খুবই হাসিখুশি। আমাদের গ্রামের একজন স্যারের স্ত্রী ২২টি সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং আমাদের বাড়ির পাশের এক মহিলা ২১টি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তবে সময় বদলেছে, স্ত্রী তথা নারীরা এখন সচেতন। যারফলে তারা আর এত সন্তান জন্ম দেন না। এতেই কি নারী জাতীর উন্নয়ন ঘটেছে? সমাজের উন্নয়ন সাধন হয়েছে?

বর্তমানে অনেক নারীই সন্তান নিবেন কিনা সে ব্যাপারে তার মতামত দিতে পারেন। এর মাধ্যমে অবশ্যই একটি অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার এক দাদীর বিয়ে হয়েছিল ৯ বৎসর বয়সে কিন্তু এখন মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বৎসর। যারা এ অগ্রগতি সাধনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই।

সেদিন আমাদের সন্তানদের নিয়ে ঢাকা শিশুপার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে, ৪ ও ৫ বছর বয়সের দু'টি কন্যাশিশু কালো রঙের বোরখা পরা। শিশু দুটির চোখ আর হাতের কব্জি ছাড়া আর সবই কালো বোরখায় আচ্ছাদিত। আমি বোরখা পরা বিষয়টিকে খারাপ চোখে দেখছিনা। তবে যেটা বলতে চাই, সেটা হলো আমরা কতদুর এগুতে পেরেছি?

আমার বড় ভাইয়ের ছোট ছেলে (গ্রামে থাকে) সে আমাদের মেয়ের তিন মাসের বড়, সে ভুলত্রুটি মিলে একটু একটু পড়তে ও লিখতে পারে। তুলনামূলকভাবে আমাদের কন্যাশিশুটি একটু বেশিই বাংলা/ইংরেজী দেখে, মুখস্ত পড়তে ও লিখতে পারে (সে ঢাকায় থাকে)। আমার খালাতো বোনের মেয়ে আমাদের মেয়ের ৩ দিনের বড়। সে বাংলা, ইংরেজী ও ধর্ম গ্রন্থ বেশ ভালোভাবে পড়তে পারে। অবশ্য তাদের সুযোগ হয়েছিল বাংলাদেশের বাইরে কিছু দিন থাকা এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করার। আমাদের কন্যাশিশুটিকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবার কতটুকু চেষ্টা আমরা করি। আমরা কি আমাদের কন্যা এবং ছেলেশিশুকে "শিশু" হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনা? আমরা কি পারিনা আমাদের সন্তানকে "মানুষ" হিসেবে গড়ে তুলতে?

সন্তানদেরকে আমরা খুব আদর করি, ভালোবাসি এবং তাদের ভালো চাই। অবশ্যই এটা একটি ভালো দিক। কিন্তু আপনার কন্যাশিশুকে মানুষ করে গড়ে তুলবার কি কি পরিকল্পনা আছে, নিজেকে একটু প্রশ্ন করবেন? একটু নিজের কাছে কি প্রশ্ন করবেন যে, আপনার সন্তান বিশেষ করে কন্যাশিশুটি বিপদগামী হচ্ছে কিনা? কখনো কি নিজের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে, আপনার কন্যাশিশুটি ভালো হলে কেন ভালো? কিংবা খারাপ হলে কিভাবে খারাপ হলো? আপনার শিশু যদি খারাপ হয়, তবে প্রথমে নিজের কাছে প্রশ্ন করেন। আপনি কি তার খারাপ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন? আপনি হয়তো দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বুঝতে পারছেন না। তাই একটু ভাবুন, দেখবেন আপনার অজান্তেই হয়তো আপনার কন্যাশিশুকে খারাপ হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

আমি এমন অনেক ঘটনা জানি যেখানে কন্যাশিশু খারাপ হওয়ার জন্য বাবা-মা ও পরিবারের ছেলে সন্তান কিংবা পরিবারের অন্য কোন ব্যক্তি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আর সে কারণে আপনার আদরের কন্যাশিশুটি মাদকাসক্ত হয়েছে অথবা বিপদগামী হয়েছে অথবা অন্য কোন বিষয়ে খারাপ হয়ে গেছে। এমন অবস্থা হলে আপনি কাকে দোষ দিবেন? ঐ কন্যাশিশুটিকে? কেউ ভালো হলে একদিনে ভালো হয় না, আবার কেউ খারাপ হলে একদিনে খারাপ হয় না। যে ভালো হয়েছে সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভালো হয়েছে আর যে খারাপ হয়েছে সে তিল তিল করে খারাপ হয়েছে। যে কন্যাশিশুটি খারাপ হয়েছে সে কিন্তু আপনার চোখের সামনেই তিল তিল করে খারাপ হয়েছে। কোন কন্যাশিশু ভালো হলে যেমন সমাজে তার পরিবারের সকলের সুনাম বাড়ে, অপরদিকে কোন কন্যাশিশুর দুর্নাম হলে সমাজে পরিবারের সকলকে দূর্নামের ভাগী হতে হয়। শুনেছি কেউ যদি মাদক "হিরোইন" একবার সেবন করে, তবে সে পুরোপুরি মাদকাসক্ত হয়ে যায়। কন্যাশিশুরাও তেমন পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে একবার পড়লে মরণ নেশা তাকে সব সময় টানতে থাকে। চাইলেও তাকে আটকে রাখা যায় না। এজন্য কন্যাশিশুরা যাতে খারাপ পরিবেশে না মিশতে পারে এবং খারাপ হতে না পারে, সেজন্য আগে থেকেই কন্যাশিশুর জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত, সে যেন একজন আদর্শবান কন্যাশিশু ও নারী হয়ে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।

সমাজকে বলি, আপনারা কি বলবেন যে, আড়াই মাসের শিশু থেকে একটি নির্দিষ্ট বয়সের নারীরা কেন ধর্ষনের শিকার হচ্ছে? কি তার অপরাধ? আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কতটা সুদৃঢ় হয়েছে যে, কন্যাশিশু মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে? কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা আমরা তৈরি করছি, যেখানে কন্যাশিশুরা তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে? শিশুরা গড়ে উঠবে আদর্শ নাগরিক হিসেবে! কি এমন পরিবেশ নিশ্চিত করেছি, যেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে শিশু তথা কন্যাশিশু একদিন আদর্শ মানুষ হিসেবে দেশ তথা বিশ্ব পরিচালনা করবে! ঘুনে ধরা বীজ দিয়ে যদি ফসল ফলাতে চাই, তবে ফলন কি উৎকৃষ্ট মানের হবে? আপনি আমি এখন যেমন বাবা-মা, তেমনি করে আমাদের কন্যাশিশুরাও মা হবে। তাই অনুরোধ আর একবার ভাবুন, আপনার আমার কন্যাশিশুর অবস্থান কোথায়? যে সমাজ আমরা বড়রা/সমাজপতিরা তৈরি করছি সেখানে কি কন্যাশিশুরা নিরাপদ?

যদি আমি আমার কন্যাশিশুটিকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে প্রথমে যে বিষয়টি ভাবা দরকার তা হলো, আমরা কন্যাশিশুটিকে ভবিষ্যতে কিভাবে দেখতে চাই? সমাজের কোন স্থানে আপনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান? একজন শিক্ষিত নারী হয়ে কেবলমাত্র নিজের সংসারে অথবা অন্যের সংসারে কাজের লোক হয়ে পরিবারের অন্যান্যদের সেবা প্রদান করবে? নাকি ঐ পরিবারের সদস্যদের সেবা যত্ন করে বাকী সময় অন্য কোনো জগত নিয়ে নিবেদিত থাকবে। আমাদের যাদের কন্যাশিশু আছে তারা কি একটু একান্তে ভেবেছেন, আপনার সংসারে যে কয়জন মানুষ আছে তাদের মধ্যে আপনার ঘরের কন্যাশিশুটি অন্যান্যদের তুলনায় শতকরা কতভাগ সুযোগ-

সুবিধা পাচ্ছে? আমার মনে হয় সকলের মনে রাখা দরকার যে, এই কন্যাশিশু একদিন তরুণী হবে, বিয়ের পর একদিন একজন "মা" হবে।

শুধু হতাশা নয়, আমাদের প্রাপ্তিও কম নয়। আমাদের দেশের সরকার প্রধান একজন নারী, আবার বিরোধীদলের প্রধানও একজন নারী। শুধু তাই নয়, সরকারি দলে আছেন একাধিক নারী মন্ত্রী ও এমপি, অপরদিকে বিরোধী দলেও আছেন একাধিক নারী এমপি। আরও দেখলে দেখা যাবে সচিবসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন আমাদের নারীরা। তারা আসীন আছেন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী, পুলিশ প্রশাসন, চিকিৎসা ও শিক্ষা বভাগের বিভিন্ন স্তরে। এমনকি বিভিন্ন ধরনের সেবামুলক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বে নারী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও নারী, বলতে পারবেন কোন কাজে নারী নেতৃত্ব নেই? সমাজের সন্মানিত স্থানে যারা অসীন আসেন তাদের সকলের জন্ম একজন নারীর গর্ভে, সেই "মা" এর একটি প্রতিকৃতি হচ্ছে আজকের শিশু। সমাজে যিনি পতিতাবৃত্তির কাজ করেন তিনি ও চান না তার কন্যাশিশুটি আর একজন পতিতা হয়ে গড়ে উঠুক। আর সে কারনে আমাদের অনেক সহকর্মী এখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত যাদের মা পতিতাবৃত্তির কাজ করেন। সর্বোপরি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সকল স্তরে নারীর গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা আজ অস্বীকার করার নয়। যা সার্বিকভাবে সমাজের চাকাকে গতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখছে। সকলের মনে রাখা দরকার, উপরোক্ত সকল নারী কিন্তু একদিন কন্যাশিশু ছিলেন।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে কৃষিকাজ হয়, তার প্রথম বিকাশ ঘটে নারীর হাত ধরে। অনেকেরই হয়তো জানা আছে, পৃথিবী সৃষ্টির পর হতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- আদিম সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। আদিম সমাজে মানুষ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, ফলমুল খেত, পশু ও মাছ শিকার করতো আর সেগুলো কাঁচা কিংবা আগুনে ঝলসিয়ে খেত। নারী একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকতো। সময়ের বিবর্তনে এক সময় নারী আবিষ্কার করে বিভিন্ন ফল হতে পুনরায় ফলের গাছ হয়, তা থেকে আবার ফল হয়। সে সময় হতে নারী কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়ে। পুরুষ তখন খাবারের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর নারী তার আশে পাশেই বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজ শুরু করলো। সময়ের বিবর্তনে নারী হলো "মা"। নারী আস্তে আস্তে সন্তানের সেবাযত্ন, লালন পালনে জড়িয়ে গেল এবং তখন থেকেই কৃষিকাজ পুরুষদের হাতে চলে যেতে থাকলো।

আমার এ লেখার শুরুতে এক রাশিয়ান নারীর ৬৯টি সন্তানের কথা বলেছিলাম। আজ সে অবস্থার বদল হয়েছে। নারী তার প্রয়োজনে সন্তান নিচ্ছে অথবা সন্তান নেয়া না নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। আর এ কারণে দেশও অনেক এগিয়েছে। প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে কিন্তু আমরা বদলাচ্ছি কি? আমাদের কন্যাশিশুর ব্যাপারে ভাবছি কি?

দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশের একটি দেশ হাইতি। ২০১০ সালে সে দেশে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে শতশত মানুষ আহত ও মৃত্যুবরণ করে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী আহত ও মৃত্যুবরণ করে। সেই ভূমিকম্পে শিশুদের আর্তনাদ আঘাত হেনেছিলো কানাডার একটি স্কুলের কিছু ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে। তাদের কয়েকজন হাইতির সেই শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তাদের প্রতিদিনের টিফিনের অর্থ হতে কিছু কিছু অর্থ জমাতে শুরু করে, এর পাশাপাশি স্কুলের ছুটির দিনগুলোতে বিভিন্ন শপিংমল এ গিয়ে কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে। এ থেকে যে সামান্য অর্থ তারা জমাতে পেরেছিল তা পরবর্তীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল হাইতির সেই শিক্ষার্থীদের জন্য। এ বিষয়টি দিয়ে আমি যা বুঝাতে চাই তা হলো; ছাত্র-ছাত্রীদের জমানো অর্থ হাইতির শিশুদের তেমন কোনো বড় উপকারে আসে নাই,

তবে সেই সকল শিশুর বিবেকে যে মানবতা বোধ জন্মেছে তা অবশ্যই তাদের পরবর্তী জীবনে প্রভাব ফেলবে। সেজন্য আমাদের কন্যাশিশুকে যদি মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে পরে নয়, এখনই আপনার কন্যাশিশুকে নিয়ে ভাবুন। আমরা উপকৃত হবো, সমাজ উপকৃত হবে, দেশ উপকৃত হবে এবং নারী জাতির উন্নয়ন হবে।

একজন শিক্ষিত মা একটি সমাজ, দেশ তথা জাতিকে বদলে দিতে পারে, এমন উদাহরন সমাজে তথা পৃথিবীতে অনেক আছে। আমি যদি আমার মাকে ভালোবাসি, সে যদি হয় আমার কাছে পৃথিবীর সেরা ব্যক্তি, তবে আমাদের কন্যশিশুকে কিভাবে ভবিষতে দেখতে চাই, তা ভাবা উচিত। আমরা অনেকেই মনে করি যে, আমাদের কন্যাশিশুটি বড় হোক, তারপর বিষয়টি নিয়ে ভাবা যাবে। মনে রাখবেন গোখরা সাপ বড় বেলায় যতটা বিষধর, ছোটবেলাতেও অনুরূপ। তাই আজকের "মা" অতীতের কন্যাশিশু।

মুল্যবোধ এমন একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়, যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিফলন ঘটে। আর তাই আমি মনে করি, কন্যাশিশুর বিষয়ে প্রত্যেকের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তা সম্ভব হলে আমাদের সমাজের তথা দেশের ভাবমুর্তি উজ্জল করতে আজকের কন্যাশিশু যেমন গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে অপরদিকে তেমনি আগামী দিনের নারী সমাজ তথা দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে বলবো, প্রত্যেকে যতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো, ততদিন এ সমাজ তথা সমাজের মানুষের কাছে বিভিন্ন কারণে ঋনী হয়ে থাকবো, আর এ ঋণ পরিশোধ করতে এই সমাজের মানুষদের জন্য, সমাজের জন্য, সর্বোপরি কন্যাশিশুর জন্য কিছু করতে হবে। আসুন, আজ আমরা অঙ্গীকার করি "আমাদের কন্যাশিশুর জন্য একটি নিরাপদ সমাজ গড়বো এবং তাদের গড়ে তুলবো আদর্শবান হিসেবে"।

লেখকঃ মোঃ আহছান জাকির মিঠু, চেয়ারম্যান, অর্নব হিড ফাউন্ডেশন।

শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের অগ্রযাত্রার পথে অন্যতম বাধা

মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকারকে সম-অধিকার হিসেবে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশ সিডও সহ বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক দলিলে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে সমাদৃত। সর্বশেষ নারী ও শিশু নীতিমালা চূড়ান্তকরণের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আইনে উল্লেখিত শিশুদের সঠিক বয়স নির্ণয় নিয়ে যে বিদ্যমান পার্থক্য তার সমাধান হয়েছে। নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনায় ভালো অবস্থানে থাকলেও কন্যাশিশুর বিয়ের হার এখনও উল্লেখযোগ্যহারে কমেনি। ১৯৮০ এর দশক থেকে বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থা শিশুবিবাহ রোধে কাজ করে আসছে, তথাপিও শিশুবিবাহ রোধ করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর দিয়ে শিশুবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে। তবে গত দুই দশকে শিশুবিবাহের হার কিছু কিছু এলাকায় কমেছে। কিন্তু কোথাও কোথাও শিশুবিবাহের হার পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে (১৯৪৮) বিয়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত ও স্বাধীনতার কথা বলা হলেও অবিভাবকরা কন্যাশিশুদের মতামতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন না। ইউনিসেফ এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে শিশুবিবাহের এক ভয়ালচিত্র ফুটে উঠেছে।

ইউনিসেফ এর বরাত দিয়ে গত ১৬ জুলাই, ২০১৩ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের রংপুরসহ উত্তর অঞ্চলে প্রায় ২০ লাখ কিশোরী শিশুবিবাহের শিকার হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও শিশুবিবাহের শিকার হচ্ছে কিশোরীরা। স্থানীয় প্রশাসন খবর পেয়ে শিশুবিবাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নিলেও পরবর্তীতে তা আবার সংঘটিত হচ্ছে।

প্রতি বছর এ অঞ্চলে হাজার হাজার কিশোরী শিশুবিবাহের শিকার হচ্ছেন। সহায় সম্বলহীন, হতদরিদ্র ঘরের মেয়েরা বিয়ের পর যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে স্বামীর অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে সংসার ছাড়া হচ্ছেন। অল্পবয়সী এই গৃহবধূদের অনেকেই পরিবারের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছেন। বিশ্বায়নের এই সময় মানুষ যখন চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে বসবাসের জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে লাখ লাখ তাজা ফুল অকালে ঝরে যাচ্ছে শিশুবিবাহের মত অভিশাপ মাথায় নিয়ে। যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

শিশুবিবাহের শিকার পঞ্চগরের লিলি, লালমনির হাটের মজিদা, ঠাকুরগাঁওয়ের জহুরা বেগম, রংপুর সদরের আরিফা বেগম, বগুরার আমেনাসহ বেশ কয়েকজন জানান, কিছু বুঝে উঠার আগেই অপরিণত বয়সে তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে। বিয়ের পর শুধুমাত্র যৌতুকের কারণে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে পাষন্ড স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

শিশুবিবাহের শিকার অনেকেই তিন মাসের বেশি স্বামীর ঘর করতে পারেনি। এক পর্যায়ে সহায় সম্বলহীন পিতা-মাতার কাঁধে চড়ে জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন এসব কিশোরীরা। ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে শিশুবিবাহকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে ২১ বছরের নিম্নে কোন সাবালক পুরুষ ও ১৮ বছরের নিম্নে কোন সাবালিকা নারী যদি বিবাহে আবদ্ধ হয় তাহলে সর্বোচ্চ এক মাস কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। উক্ত আইনের ৫ ধারায় শিশুবিবাহ সংগঠনে সহায়তাকারী অবিভাবক, পরিচালক ও নির্দেশকের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও শিশুবিবাহ থেমে নাই।

সম্প্রতি শিশুবিবাহ আর যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার ২৫ জন কিশোরীকে সহায়তা দেয়ার জন্য বেসরকারি সংস্থা আরডিআরএস তাদের সেফ হোম আলোকিত ভবনে নিয়ে আসে। ভাগ্যবঞ্চিত এসব কিশোরীদের এক বছর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংস্থা থেকে দর্জির কাজ, ষ্টিচিং ও এমব্রয়ডারিসহ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা এখন স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। আরিফা, জোহরা ও শিল্পীরা সকলেই ছিলেন নিরক্ষর। সেফ হোমে এসে এখন তারা পত্রিকা ও গল্পের বই পড়তে পারেন। এখন তাদের একটাই কামনা, আর তা হলো- নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। পিতা-মাতার বোঝা হয়ে যেন না থাকতে হয়। স্বাবলম্বী হয়ে নিজের ও দেশের জন্য ভাল কিছু করার স্বপ্ন দেখছেন হতভাগ্য এসব কিশোরীরা।

পঞ্চগড়ের লিলি জানান, মাত্র ১২ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক মাস যেতেই তার উপর শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। পাষণ্ড স্বামী ৩০ হাজার টাকা যৌতুক দাবি করেন। কিন্তু লিলির পিতা এতটাই হতদরিদ্র যে নিজেরাই দু বেলা পেট ভরে ভাত খেতে পারে না আর যৌতুক দেবে কোথা থেকে। এক পর্যায়ে স্বামী তাকে মারপিট করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। লিলি এরপর একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাঠকর্মীর মাধ্যমে রংপুরে সেফ হোমে এসে এক বছর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি এখন জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

ফাতেমা ও ঝর্ণাসহ অনেকেই জানান, বিয়ের পর তাদের মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করা হয়েছে। যৌতুকের অভিশাপে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তারা পিতা-মাতার বোঝা হয়ে দিন যাপন করতেন। ভাগ্য বঞ্চিত এসব কিশোরীরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানায়, কোন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের যেন অল্প বয়সে বিয়ে না দেন ।

উত্তরাঞ্চলে শিশুবিবাহের শিকার হওয়া ২০ লাখ কিশোরীর মধ্যে হাতে গোনা দু চার জনের পাশে বিভিন্ন এনজিও দাঁড়ালেও বাদ বাকীরা রয়েছে ভাগ্যবঞ্চিতদের তালিকায়। এদের দীর্ঘশ্বাস শোনার কেউ নেই। এদের পাশে দাঁড়াবারও কেউ নেই। অনাহার ও অপুষ্টির শিকার ও সামাজিক মর্যাদা বঞ্চিত এই কিশোরীরা অল্প বয়সে একাধিক সন্তানের মা হচ্ছেন। বৃদ্ধ হবার আগেই মারা যাচ্ছেন অনেকে। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশে বর্তমানে ১৫ বছর বয়সে ৩০ শতাংশ এবং ১৮ বছরের নিচে ৩৯ শতাংশ কন্যাশিশুর বিয়ে হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতি ১০ জন কিশোরীর মধ্যে তিন জনকে ১৫ বছর হওয়ার আগে বিয়ে দেয়া হয়। আর প্রতি তিনজনের মধ্যে দু জনকে বিয়ে দেয়া হয় ১৮ বছরের আগে। উত্তরাঞ্চলে প্রায় তিন কোটি দশ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ৬০ লাখ কিশোরী। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হচ্ছে ১৫ বছর বয়সে আর ৩৯ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের নিচে। শিশুবিবাহের শিকার হওয়া এসব কিশোরীরা বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

মূলত: আমাদের কাঠামোগত দুর্নীতির ফলাফল হচ্ছে দারিদ্র্যতা এবং দরিদ্র পরিবার। যা একবিংশ শতাব্দীর শিশুবিবাহের অন্যতম প্রধান কারন। আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা ও অনুশীলন সবকিছুই শিশুবিবাহকে এখনো উৎসাহিত করে। শিশুবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম কিন্তু পুলিশ বাহিনী মাঝে মাঝে টাকার কাছে হেরে যান। আমাদের সামগ্রিক অব্যবস্থার বলি হতে হচ্ছে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিববারের কিশোরীদেরকে। তবে এতসব অব্যবস্থার মাঝে আমাদের চুপ করে বসে থাকলে হবে না। তরুণ প্রজন্মের এই বিশাল সংখ্যক কিশোরীদেরকে শিশুবিবাহের মত ভয়াল অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক শিশুবিবাহ রোধে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা ও সচেতন নাগরিক সমাজ নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা দরকার:

- ইউনিয়ন তথ্যসেবা প্রদান কেন্দ্র থেকে শিশুবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর লিফলেট বিতরণ, ডকুমেন্টারী শো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

- কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিশোরীদের জন্য নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে আপামর জনতার মাঝে গণসচেতনতা তৈরি করা।
- সরকারি স্কুলসমূহে কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; যেন তারা নিজেরা সচেতন হয়ে শিশুবিবাহ প্রতিরোধে সমাজে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করতে পারেন।
- অবিভাবকদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- এনজিও এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় পারিবারিক আইনের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- শিশুবিবাহ প্রবণ এলাকায় প্রতি ৬ মাস পর পর জরিপ চালানো এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।

লেখক: মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত, মানবাধিকার কর্মী ও কলাম লেখক।

শিশুবিবাহ প্রথা বিলোপঃ কন্যাশিশু দিবসে প্রত্যাশা

রওশন জাহান

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানবসমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলির অন্যতম প্রধান হিসেবে শিশুবিবাহকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। এই কুপ্রথার ফলে পৃথিবীব্যাপী দীর্ঘকাল ধরে কন্যাশিশুদের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। তাদের মৌলিক মানবাধিকারগুলি পদদলিত হয়েছে। যেসব বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার তারা হয়েছে তার মধ্যে অবশ্যই পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সম্পদ প্রাপ্তি ও ভোগের অধিকারে অসাম্য সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র- কোন প্রতিষ্ঠানই তাদের সুরক্ষা দেয় নি।

নারী সমাজের সৌভাগ্য যে বিগত দুই শতকে বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে এবং ক্রমবর্ধমান অধিকার সচেতন নারী আন্দোলনের জোরালো দাবীর মুখে পৃথিবীর বহুদেশে এই কুপ্রথা বিলুপ্ত প্রায়। কিন্তু একজন সচেতন শিক্ষানুরাগী ও নারী অধিকার কর্মী হিসেবে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশে আজও এই কুপ্রথা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের কন্যাশিশুদের জীবনকে অভিশপ্ত করে চলেছে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও আইসিডিডিআরবি পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে যে, ৬৪ শতাংশ কন্যাশিশুই (১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে) শিশুবিবাহের শিকার এবং এদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বাস করে (*ডেইলি স্টার*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)।

কেন এই প্রথা এখনো আমাদের দেশে বিলুপ্ত হয় নি বা বিলোপ করা সম্ভব হয় নি? এমন নয় যে দেশের সচেতন নাগরিকরা এর বিলোপের দাবী করেন নি বা সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ আমলেই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং তা চলমান আছে। তারপরও কেন এ প্রথা বিলোপ করা সম্ভব হয় নি? তার উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পরিবারে নারীর ভূমিকা এবং অবস্থান ও বিবাহ প্রথার গুরুত্ব এবং উপযোগিতার দিকে নজর দিতে হবে।

আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক এবং বংশ পরিচয় পুরুষভিত্তিক। সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূলে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ; যার মূলমন্ত্র জেন্ডার-বৈষম্য অর্থাৎ পুরুষ প্রাধান্য এবং নারীর অধঃস্তনতা। পরিবারে সকল সম্পদের মালিকানা পুরুষের; কর্মকাণ্ডের মূল পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেন পুরুষ। সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও পুরুষেরই হাতে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যারা বহুলাংশে পুরুষ প্রধানের ওপর নির্ভরশীল এবং সামাজিক নিরিখে ক্ষমতাহীন বা তাঁর সহকারী মাত্র। কর্মকাণ্ডের ফলভোগে পরিবার প্রধানের থাকে নিরঙ্কুশ অধিকার; যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অসম বন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ সম্পদের মালিক ও প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর চাহিদা মেটানোর পর অবশিষ্টাংশ ক্ষমতাহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এমনকি যখন বাস্তবিক বন্টন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব কোন ক্ষমতাহীন সদস্যের হাতে থাকে তখনও অসম বন্টনের মূলনীতি ও রীতির কোন ব্যত্যয় হয় না। উদাহরণস্বরূপ- আমরা গ্রামীণ গৃহস্থ পরিবারে প্রচলিত সনাতনী খাবার পরিবেশনের রীতি বা চিত্র তুলে ধরতে পারি। রান্নাবান্না ও পরিবেশনের মূল দায়িত্ব থাকে গৃহিণীর ওপর যিনি একজন নারী। তিনি পরিবেশনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পুরুষ পরিবার প্রধান ও অন্য পুরুষ সদস্য এমনকি শিশুদের (ভবিষ্যত ক্ষমতার মালিক) সন্তোষ বিধানকে অগ্রাধিকার দেন। তারপর অবশিষ্টাংশ পরিবারের অন্য সদস্যদের দিয়ে নিজের জন্য রাখেন শেষ তলানিটুকু।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন সকলে বিশেষতঃ নারীরা এই রীতিকে স্বাভাবিক মনে করেন? উত্তর খুবই সহজ। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে অতি শৈশবেই তাদের সমাজ নির্দিষ্ট ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন

করা হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারে বাবা-মা এবং অন্যান্য অভিভাবক এর দায়িত্ব নেন। উপদেশ, নির্দেশ, রীতি-নীতি এবং প্রথার (যেমন উপরে বর্ণিত পরিবেশন প্রথা) মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে তারা পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, মন মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং ব্যবস্থাকে কেবল স্বাভাবিকই নয়, ন্যায্য বলেও মনে করে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর জন্য নির্দিষ্ট দুটি ভূমিকা হলো- গৃহিণী ও জননী। এই ভূমিকা পালনের জন্য সমাজস্বীকৃত পন্থা বিবাহ; যার মাধ্যমে সে নিজ কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ যে পুরুষের সঙ্গে তার বিবাহ হয় তার গৃহে প্রবেশ করে। এ জন্যই কন্যার বিবাহ নিশ্চিত করা তার পিতামাতার জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তা পালনের জন্য সামাজিক চাপ থাকে প্রচূর। অন্যপক্ষে বংশগতি অব্যাহত রাখার জন্য পুত্রের বিবাহের জন্য আগ্রহী থাকেন তার পিতামাতা।

গ্রামীণ দরিদ্র/সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে এই সামাজিক তাগিদের সঙ্গে একটি আর্থিক বিবেচনাও কাজ করে। যেসব পরিবার শ্রমঘন জীবিকা নির্ভর, তাদের জীবনযাত্রা সচল রাখার জন্য স্বল্পমূল্যে শ্রম জোগান অব্যাহত থাকা আবশ্যক। বিবাহের মাধ্যমে এই রকম পরিবারে যে নারীকে সদস্য হিসেবে পাওয়া যায়, সে স্বল্পতম মজুরীতে (পড়ুন পেটেভাতে) শর্তহীনভাবে পরিবারের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যেমন জীবনমান বজায় রাখতে অবদান রাখে, তেমনি অকাতরে সেবাদান করে পরিবারের সকল সদস্যের বহুমুখী চাহিদা মেটানো ও সন্তোষ বিধান করার চেষ্টা করে। তার ওপর পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ সন্তানের জন্মদান ও পালনের মাধ্যমে ভবিষ্যত শ্রম জোগানের ধারাও নিশ্চিত করে। বলাবাহুল্য এই নিরিখে বিবাহকে শ্রম জোগান নিশ্চিত করার একটি নির্ভরযোগ্য এবং ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থা বলে মনে করা স্বাভাবিক। তাই অযথা কালবিলম্ব না করে 'শুভকাজ' সমাধা করার জন্য পাত্রপক্ষের আগ্রহ থাকা এবং শিশুবিবাহকে গ্রহণযোগ্য মনে করার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। পাত্রপক্ষের অনেক অভিভাবক বিশেষতঃ মায়েরা বলেও থাকেন "অল্পবয়সী বৌ ঘরে আনা ভাল, গড়ে পিটে নেওয়া সোজা হয়।" অন্যপক্ষে পাত্রীর বাবা-মা তথা অভিভাবকও মনে করেন এবং বলেন, "সেই তো পরের ঘরে মেয়েকে দিতেই হবে। তো দেরী করার দরকার কি?" মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পাত্রের হাতে মেয়েকে অল্পবয়সে তুলে দিতে পারলে অর্থাৎ তার ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব অন্য কারো হাতে দিতে পারলে তারা সামাজিক এবং আর্থিক উভয় দিকেই চাপমুক্ত হতে পারেন।

একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক সময়ে যৌতুক প্রথার বিস্তার এবং নারীর প্রতি যৌন হয়রানির এবং অন্যান্য নির্যাতন বৃদ্ধির কারণে কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। এতে কন্যাশিশুর অভিভাবকদের ওপর চাপ বেড়েছে অনেক। এ অবস্থায় অনেক দরিদ্র পরিবারই শিশুবিবাহকে চাপমুক্তির একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা বলে মনে করছে। আর্থ-সামাজিক এসব আন্তঃসম্পর্কিত কার্যকরণের কারণে শিশুবিবাহ এখনো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শিশুবিবাহের কারণে পাত্রপক্ষ এবং পাত্রীপক্ষ উভয়েই আশু সুফল পেলেও কন্যাশিশুদের জীবনে এ প্রথা ডেকে আনে দীর্ঘমেয়াদী দুর্ভোগ। শিশুবিবাহের কারণে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়। অকাল মাতৃত্ব, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকির শিকার হয় সে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে পুষ্টিহীন ও রুগ্ন শিশুর জন্ম দেয়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, দেশের প্রায় ৩৬ শতাংশ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এ কারণে কেবল যে শিশু এবং তার পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, শ্রম ঘন্টার পরিমাপে দেখা গেছে যে, জাতীয় অর্থনীতির ওপরেও উল্লেখযোগ্য বিরুপ অভিঘাত রাখে এই অপুষ্টি (*দি ডেইলি ষ্টার*, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)।

শিশুবিবাহের শিকার কন্যাশিশুরা পুষ্টিহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য, শিক্ষা বঞ্চিত, স্বাধীন উপার্জনের উপায়বিহীন এক চরম পরনির্ভর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। সবচেয়ে শোচনীয় বাস্তবতা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে স্বামীর ঘরকে তার পরিবার ও সমাজ 'নিরাপদ আশ্রয়' বলে চিহ্নিত করে থাকে, সেই স্বামীর ঘরেই সে পদে পদে নিগৃহীত ও অবহেলিত হয়। এমন কি স্বামী ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের হুমকির মুখে চরম নিরাপত্তাহীন মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়।

শিশুবিবাহ প্রথা বিলোপের প্রচেষ্টা যে এতদঞ্চলে বহু আগেই করা হয়েছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ব্রিটিশ আমলে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দাবী আমলে নিয়ে ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে বিবাহের বয়সসীমা পুরুষের জন্য ২১ বছর আর মেয়েদের ১৮ বছর বলে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় পারিবারিক আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও সংযোজন করে শিশুবিবাহ নিরোধ প্রথাকে জোরদার করার চেষ্টা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণকে উৎপাদিত করার লক্ষ্যে নানা প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসবের প্রত্যাশিত সুফলের অন্যতম ছিল শিশুবিবাহের ক্রম বিলোপ। গ্রামীণ নারীদের আয় উপার্জন করার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যেও ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। নারী নির্যাতন রোধের জন্য নানা নিবর্তনমূলক আইন ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও সুফল ভোগের সুবিধা ও সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীনীতি, বেইজিং পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৯৮৪ সালে সিডও সনদ এবং ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। এসবের ফলে শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নারীর মৌলিক মানবাধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও বর্ধন করার দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তেছে এবং এই লক্ষ্যে সমাজের বিরাজমান নারী-পুরুষ বৈষম্য বিলোপ করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার তাগিদও রয়েছে। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত বহুবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় নি। এর কারণ বহুবিধ। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যেমন- নীতি, আইন ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধতা, প্রয়োগে শৈথিল্য, নজরদারিতে দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থ বরাদ্দে অপ্রতুলতা।

পরিকল্পনা ও প্রণয়ন পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা হলো- সমস্যার পটভূমি ও আর্থ-সামাজিক আন্তঃসম্পর্কিত কারণসমূহের বিশদ বিশ্লেষনে জেন্ডার প্রেক্ষিতের অভাব এবং সম্যক উপলব্ধির অভাব। এর একটি মূল কারণ অবশ্যই আইন প্রণেতা ও পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে নারীর উপস্থিতি প্রান্তিক এবং পুরুষদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা প্রায় অনুপস্থিত। বস্তুতঃ সমাজে যতদিন পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শগত লিঙ্গ বৈষম্যকে বৈধ মনে করা হবে এবং পরিবারে ও বিবাহিত জীবনে নারী-পুরুষের ভিন্ন ভূমিকা, অসম অবস্থা ও অবস্থানকে অপরিবর্তনীয় মনে করা হবে, ততদিন শিশুবিবাহ প্রথা বিলোপ সাধন করা সম্ভব হবে না। সামাজিক মতাদর্শের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক সমাজে তার কর্ণধার হওয়ার দায়িত্ব প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ওপর বর্তায়। কিন্তু এই রকম প্রচেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারী-পুরুষ সমতার আদর্শের প্রতি যে রকম দৃঢ় অঙ্গীকার এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা অত্যাবশ্যক, দুঃখের বিষয় হলো যে আমাদের দেশে এখনো তা আছে বলে মনে হয় না।

তবে এইরকম সদিচ্ছা জাগ্রত করার লক্ষ্যে সচেতন নাগরিকবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। বেশকিছু নাগরিক সংগঠন ইতোমধ্যেই নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপের লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন। শিশুবিবাহ প্রথা বিলোপকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁরা জনসচেতনতা ও জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কর্মসূচি নিতে পারেন। শিশুবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে পারেন, আইনী সহায়তা দিতে পারেন এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য রোধের জন্য নজরদারিতে সহায়তা করতে পারেন। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক পরামর্শ দিতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়

কন্যাশিশুর বর্ধিত অংশগ্রহণ যাতে অব্যাহত থাকে এবং ঝরে পড়া যাতে কমে যায় সেই লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নিতে পারেন। 'নারীরাও মানুষ' তারাও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা পাওয়ার জন্য দাবীদার এই চেতনা ছড়িয়ে দিতে পারেন জনমনে।

সর্বোপরি বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ না করে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করলে তা ফলপ্রসু হতে বাধ্য। শিশুবিবাহ বন্ধে দেশের নাগরিকরা যদি সমবেত দাবী তোলেন এবং এই লক্ষ্যে যথোপযোগী পদক্ষেপ নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হন তাহলে এই কুপ্রথা অচিরেই দূর হবে। ভবিষ্যতের কন্যাশিশুদের জীবন শিশুবিবাহের অভিশাপমুক্ত হবে, কন্যাশিশু দিবসে এই আমার প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা।

লেখক: রওশন জাহান- প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নারী অধিকার কর্মী।

শিশুবিবাহ: কারণ ও প্রতিকারের উপায়

শীপা হাফিজা

শিশুবিবাহ বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। শিশুবিবাহের কারণে ছেলে-কন্যাশিশু উভয় শিশুরই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। শিশুবিবাহ কীভাবে নারীর শৈশব-কৈশোর আর স্বপ্নময় যৌবনের দিনগুলোকে কেড়ে নেয়, কী অমানবিক করে তোলে জীবনকে, তার মনের আকাশ, দৃষ্টি সীমানায় কী ভয়ঙ্কর আর গভীর কালো এক পর্দা টেনে দেয়–তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। শিশুবিবাহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক নির্মম ব্যবস্থা। যতই সময় যাচ্ছে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় শিশুবিবাহ অত্যন্ত ভয়াবহ একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। শিশুবিবাহের পরিণতিতে শুধু শিশু, অল্পবয়সী নারী বা তার পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এতে দেশ হয় অপুষ্ট ও দুর্বল মেধাহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী।

শিশুবিবাহ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বিশ্বের যে কয়টি দেশে শিশুবিবাহের হার বেশি, এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। ২০১১ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত 'প্রোগ্রেস ফর চিলড্রেন এচিভিং দ্য এমডিজিস উইথ ইকুইটি' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সের আগে ৬৬ শতাংশ কন্যাশিশু এবং একই বয়সের ৫ শতাংশ ছেলের বিয়ে হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে এবং দরিদ্র-নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি। শহরেও নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে শিশুবিবাহের প্রচলন ব্যাপক। বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে ৬৯ শতাংশ নারীর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে (*প্রথম আলো*, ২৬ আগস্ট ২০১২)। শিশুবিবাহের এই হার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

শিশুবিবাহের কারণ

দারিদ্র্য: শিশুবিবাহের প্রধান কারণ হিসেবে দারিদ্র্যকেই চিহ্নিত করা হয়। দারিদ্র্য যেহেতু মানুষের সকল মৌলিক চাহিদাকে অবরুদ্ধ করে ফেলে, সেহেতু মানুষ তখন প্রয়োজনের কাছে সকল বিবেচনাকে জলাঞ্জলি দেয়। দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করলে একটি অল্প বয়সী কন্যাশিশু পরিবারে অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। এমন অবস্থায় কন্যাশিশুকে বিয়ে দিতে পারলেই যেন বাবা-মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই ধরনের বিয়ে ওইসব পরিবারের দারিদ্র্য মোকাবিলার একটি কৌশল।

অজ্ঞতা ও অশিক্ষা: অজ্ঞতা ও অশিক্ষাও শিশুবিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাংলাদেশের এমন অনেক স্থান আছে যেখানে এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। এসব পরিবারে কন্যাশিশুদের দ্রুত বিয়ে দেওয়াকে দায়িত্ব মনে করা হয়। শিশুবিবাহের কারণে কন্যাশিশুটির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বাবা-মা ও সমাজ নিজ সন্তানকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে দ্বিধা করে না।

পরিবারের সম্মান ও নিরাপত্তাহীনতা: পরিবারের সম্মান রাখার দায়, বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হলে এসিড-সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার আশঙ্কা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার বিষয়গুলোকে কন্যাশিশুদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া এখনো আমাদের গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক অভিভাবকেরা সাধ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য এবং নাতি-নাতনির মুখ দেখার বাসনায় অল্প বয়সেই কন্যাশিশুদের বিয়ে দেন।

আমাদের দেশের সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কন্যাশিশু বড় হলেই নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। এমতাবস্থায় কন্যাশিশুকে বাড়িতে রাখতে বা স্কুল-কলেজে পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তারা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই বাবা-মা কন্যাশিশুকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। রাস্তাঘাটে যৌন হয়রানি বা উত্ত্যক্তকরণের কারণেও অভিভাবকেরা কম বয়সে কন্যাশিশুর বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

সামাজিক চাপ: বাল্যবিবাহের আরেকটি কারণ হচ্ছে সামাজিক চাপ। বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময় পার হলেই প্রতিবেশী ও গ্রামের মাতবরেরা কন্যাশিশুকে বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিয়ে না দিলে সেই পরিবারকে একঘরে করার হুমকি দেওয়া হয়। এ কারণে তড়িঘড়ি করে অল্প বয়সে কন্যাশিশু বিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। কন্যাশিশু বেশি পড়াশোনা করলে নিজস্ব মতামত গড়ে উঠবে এবং তখন তাকে কোনো কিছু করাতে বাধ্য করানো যাবে না–এই আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া পড়াশোনা জানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে যৌতুকের পরিমাণও বেড়ে যায়। পরে যদি ভালো ছেলে পাওয়া না যায়, সে ভয়েও অভিভাবকেরা কন্যাশিশুকে বিয়ে দিয়ে দেন।

শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে দেশের অধিকাংশ বাবা-মা কম বয়সী কন্যাশিশুর বিয়ে-পরবর্তী সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে চিন্তা করেন না। তারা তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভ বা অসুবিধা দূর করার জন্য কন্যাশিশুকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন।

এসব কারণ ছাড়াও আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, সিনেমা-নাটক ও আকাশ সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিশোরী কন্যাশিশুরা পরিবারের অমতে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রেমিককে বিয়ে করছে। এভাবে বয়স ১৮ হওয়ার আগেই অনেকে বিয়ে করছে এবং অসময়ে মা হয়ে জীবনের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

সতীত্ব : 'সতীত্ব' বিষয়টি নিয়ে সামাজিক কুসংস্কার শিশুবিবাহের একটি বিশেষ কারণ। কিশোরী কন্যাশিশুটির দিকে 'লোলুপ দৃষ্টিতে' তাকালে, হাত ছোঁয়াছুয়ি হলে, কন্যাশিশুটিকে মিথ্যা অপবাদ দিলে, সর্বপরি কাঙ্খিত বা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যৌন মিলন হলে কন্যাশিশুটির 'সতীত্ব' নিয়ে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই ভয়ে অভিভাবকরা অনেক সময় শিশু কন্যাশিশুটিকে বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে দিয়ে সমাজের রক্তচক্ষু থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। তার এই কূপমন্ডকতা ও অবিবেচনা নিজ কন্যসন্তানকে অসময়ে বিয়ে দিয়ে শারীরিক ও মানসিক দুর্যোগের দিকে নিয়ে যায়। ছোট শিশুকে সুরক্ষা দেবার দায়িত্ব অভিভাবকের, তাকে বিয়ে দিয়ে রক্ষক নিজেই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করেন।

শিশুবিবাহ ও আইন

১৯২৯ সালে শিশুবিবাহ নিরোধ আইন পাস করা হয়েছে। এ আইন ১৯৮৪ সালে সংশোধন করা হয়। আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী কন্যাশিশুর সাথে ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিয়েকেই শিশুবিবাহ বলা হয়।

২১ বছরের বেশি বয়সের কোন পুরুষ অথবা ১৮ বছরের বেশি বয়সের নারী কোন শিশুবিবাহের চুক্তি করলে সে ১ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ১ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

শুধু জাতীয় আইনেই নয়, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদে (সিডও) বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এই সনদের ১৬ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে শিশুবিবাহকে আইনগতভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিয়ের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ও বিয়ে রেজিস্ট্রেশনকে বাধ্যতামূলক করার জন্য স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আইন করবে বলে অঙ্গীকার করেছে। তারই আলোকে ২০০৪ সালে শেষবারের মতো সংশোধন করা হয় জন্মনিবন্ধন আইন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সব শিশুর জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়।

শিশুবিবাহের প্রভাব

শিশুবিবাহ শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। ঘটায় সুন্দর শৈশবের সমাপ্তি। তার নিজস্ব পছন্দ ও স্বাধীনতা থাকে না। শরীরটি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি হবার আগেই বিয়ের কারণে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বিকাশের অধিকার ও সুযোগ খর্ব হয়। শিশুবিবাহের ফলে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে শিশুরা। সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে পারে না, আবার বয়স্কদের দলেও যেতে পারে না। সব মিলে শিশুর মানসিক ও আবেগগত ক্ষত সৃষ্টি করে, যা সারা জীবনের সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

শিশুবিবাহ আসলে এক ধরনের নির্যাতনের নাম যার কারণে শিশুর মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটছে। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে শিশুটির মতামত নেওয়া হয় না। শিশুর প্রতিবাদ করারও ক্ষমতা থাকে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশু বিয়ে করতে বাধ্য শিশুবিবাহের কারণে শতকরা ৪৫ ভাগ কম ওজন ও খর্বাকৃতির (stunted) শিশুর জন্ম দিচ্ছে। এই অপরিণত মায়েরা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে শতকরা পাঁচ জন মৃত্যু-ঝুঁকির শিকার হচ্ছেন (UNICEF, State of the World's Children, 2011)।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমাদের দেশে ১৩-১৫ বছর বয়সের কিশোরীদের এক তৃতীয়াংশ এবং ১৮-১৯ বছর বয়সের তিন-চতুর্থাশ কিশোরী সন্তান ধারণ শুরু করে। ৬৪.৩ শতাংশ বাংলাদেশি বিবাহিত কিশোরী কৈশোরে গর্ভধারণ করে। ৫৩.৬ শতাংশ কৈশোরে মা হয় এবং ১০.৭ শতাংশ প্রথমবার মা হওয়ার জন্য গর্ভধারণ করে (বিডিএইচএস-২০১১)।

এমনিতেই আমাদের দেশের কিশোরীদের প্রায় ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ অপুষ্টির শিকার। বিয়ের পরই স্বামী ও পরিবারের অন্যরা সন্তানের মুখ দেখতে চায়। এক বা দুই বছরের মধ্যে সন্তান পেটে না এলে স্বামী যদি বংশরক্ষার জন্য আবার বিয়ে করে ফেলে, সে জন্য কন্যাশিশুর বাড়ি থেকেও সন্তান নেওয়ার জন্য কন্যাশিশুটিকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু এই অপুষ্ট মা কম ওজনের সন্তানের জন্ম দেয়। নবজাতক মারা যায়। মারা না গেলেও মা ও সন্তানের অসুখ লেগেই থাকে। এতে তারা পরিবার ও জাতির বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসার খরচ, পরিবারের লোকজনের কাজ কামাই দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি শুরু হয়।

শিশুবিবাহের কারণে কিশোরী বধূর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়ে। বাল্যবিবাহের কারণে কিশোরী মা মৃত্যুঝুঁকিতে থাকে। সেই অপুষ্ট মা যে শিশুর জন্ম দেয়, সে-ও থাকে মৃত্যুর ঝুঁকিতে। একইভাবে শিশুবিবাহের শিকার কন্যাশিশুটির পুরো জীবনই ঝুঁকির মধ্যে চলে যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোরীদের অল্প বয়সে বিয়ে জরায়ুমুখের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। কেননা, এই কন্যাশিশুদের জরায়ুমুখের কোষ পরিপক্ব হওয়ার আগেই স্বামীর সঙ্গে যৌনমিলন করতে হয়। এতে কোষগুলোতে বিভিন্ন ইনফেকশন হয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

শিশুবিবাহের সঙ্গে জড়িত সমস্যা শুধু গর্ভবতী মা ও ভ্রূণকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, শিশুর জন্মের পরও তা অব্যাহত থাকে। শিশুবিবাহ একজন কিশোরী, তার পরিবার এবং সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তা ছাড়া শিশুবিবাহ কৈশোরের সমাপ্তি ঘটায়, জোরপূর্বক যৌনসম্পর্কে বাধ্য করে, ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত করে, যা কিশোরীদের আবেগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিশুবিবাহের কারণে একটি কন্যাশিশুর পরিপূর্ণ মানবিক সত্তা বিকশিত হতে পারে না। এর পাশাপাশি তারা সামাজিক ও আবেগিক সুস্থতা, প্রজননস্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

অন্যান্য সমস্যা

দেশে বর্তমানে ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সেই কন্যাশিশুদের বিয়ে হচ্ছে বেশি। এরা মানসিক, শারীরিক ও যৌন জীবনে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ৫৫ শতাংশ কন্যাশিশু মাধ্যমিকে ঝরে পড়ে বিয়ের পর স্বামীর সংসারে কায়িক শ্রম দেওয়ার কারণে। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ কন্যাশিশুর বিয়ে হয় ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে। যেহেতু ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর বয়স বাড়িয়ে ১৮ বছর দেখানো হয়, যাতে সেটা শিশুবিবাহের মতো গর্হিত অপরাধের আওতার মধ্যে না পড়ে।

শিশুবিবাহের প্রথম শিকার হয় শিশু, দ্বিতীয় শিকার নারী এবং তৃতীয় শিকার সমাজ। এর সুদূরপ্রসারী ফল প্রকারান্তরে সমগ্র জাতির ওপর গিয়ে পড়ে। শিশুবিবাহ যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে নিরাপদ মাতৃত্ব অন্যতম।

শিশুবিবাহ রোধে করণীয়

নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য সঠিক বয়সকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। প্রজননস্বাস্থ্যকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক হবে। শিশুবিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তান ধারণের প্রবণতা পরিবর্তনে কন্যাশিশুদের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ্রামের কন্যাশিশুদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি গ্রামের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শিশুবিবাহ বিরোধী কণ্ঠস্বর জোরদার করতে হবে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক যে কাউকে টাকার বিনিময়ে প্রাপ্তবয়স্ক বানিয়ে দেওয়ার যে অবৈধ পদ্ধতি তা শক্ত হাতে প্রতিহত করতে না পারলে শিশুবিবাহ ঠেকানো অসম্ভব। সম্মিলিত প্রতিরোধ আর জন্মনিবন্ধনের ব্যাপারটা যদি একসঙ্গে নিশ্চিত করা যায়, তা হলে বাংলাদেশে শিশুবিবাহ রোধ করা সম্ভব।

তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাজী ও প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করা এবং দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় হলে যথাযথ শাস্তির অধীনে আনা অত্যন্ত জরুরি। সামাজিকভাবেও এসব কর্তাব্যক্তিদের দায়িত্বে অবহেলার বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে।

জন্মনিবন্ধন আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে শিশুবিবাহ সমূলে দূর না হলেও কমে আসবে অনেক। কাজীরা যদি জন্মনিবন্ধন সনদ দেখে বিয়ে পড়ান, অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সী কোন কন্যাশিশুর বিয়ে না পড়ান, তাহলে শিশুবিবাহ অনেকাংশেই কমে যাবে। এ ব্যাপারে কাজীদের সংবেদনশীল করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুবিবাহকে নিরুৎসাহিত করার জন্য গ্রামের নারীদেরকে এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, এর কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে। একইসঙ্গে শিশুবিবাহ বন্ধের জন্য মিডিয়াতেও প্রচার কার্যক্রম চালাতে হবে।

কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ নাগরিকত্ব গড়ে তোলার জন্য স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাস-ট্রেন সকল স্থানকে নারীর নিরাপদ চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হবে, যাতে করে অল্পবয়সী কন্যাশিশুদের পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত না হয়।

শিশুবিবাহ বন্ধে যুগোপযোগী কঠোর আইন প্রণয়ন এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি, তবে সবচেয়ে বেশি জরুরি সচেতনতা সৃষ্টি করা। অভিভাবকসহ সমাজের সকল মানুষ যদি সচেতন না হয় তবে কিছুতেই তা বন্ধ করা যাবে না। এ ব্যাপারে নারীদের, বিশেষ করে শিক্ষিত নারী-পুরুষ ও কিশোরদের এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সমাজের সচেতন মানুষদেরও। সমাজের সবাই যখন এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠবে তখন সৃষ্টি হবে গণজাগরণ। আর যখন পুরো সমাজ, রাষ্ট্র এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবে, তখন শিশুবিবাহের আড়ষ্টতা থেকে নারী বেরিয়ে আসবে। এই সামাজিক ব্যাধিকে সমাজ থেকে নির্মূলকরণের জন্য আমরা সমাজের সকল মহলকে শরিক হওয়ার আহবান জানাই।

লেখক: শিপা হাফিজা, মানবাধিকার কর্মী, পরিচালক- জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি ও মাইগ্রেশন কর্মসূচি, ব্র্যাক।

কন্যাশিশু : দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে কিছু করণীয়

শারমিন মুস্তারী

আজকের কন্যাশিশুই আগামী দিনের একজন নারী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়ামক শক্তি। অথচ বাংলাদেশের কন্যাশিশুদের প্রতি পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই নেতিবাচক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা চরম বৈষম্যের শিকার। কন্যাশিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে না পারলে কি করে তাদের অগ্রগতি সম্ভব?

আমাদের এখানে পরিবারে কন্যাশিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? কিভাবে বেড়ে ওঠছে পরিবারে কন্যাশিশুরা? আমরা জানি পরিবার হলো একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখান থেকেই শিশুর মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। অথচ পরিবারে কন্যাশিশুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি খুবই অনাদর, একপেশে ও বৈষম্যমূলক। পুষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবার কন্যাশিশুদের প্রতি সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করে। পরিবার কন্যাশিশুর পুষ্টির চাহিদা অনেক সময় যথাযথভাবে পূরণ করে না। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ভালো খাবারটি ছেলে সন্তানের জন্য বরাদ্ধ থাকে। তাছাড়া কন্যাশিশু বিয়ের বিষয়টি তো রয়েছেই। যে বয়সে একটি মেয়ের বুদ্ধি ও বিকাশ চলছে সে বয়সে তাকে বিয়ের মধ্য দিয়ে তার পুষ্টি ও স্বাস্থ্য চরম হুমকির মধ্যে পড়ছে। পুষ্টিহীনতার কারণে বুদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় বলে পরিণত বয়সে তারা খুব বেশি কাজ করতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষণীয়। মেয়েটি যেহেতু একদিন পরের বাড়ি চলে যাবে। অর্থ উপার্জন করে বাবা-মাকে সাহায্য করতে পারবে না। এই মানসিকতার কারণে অনেক পরিবার কন্যাশিশুদের শিক্ষা অর্জন করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকাটি পালন করে না।

কন্যাশিশুর নিরাপত্তার বিষয়েও আমাদের পরিবারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই থাকে চরম উদাসীন। কন্যাশিশুরা খুব ছোটবেলা থেকেই ঘরে-বাইরে বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। অধিকাংশ পরিবার এ বিষয়ে সচেতন নয়। বাইরে কোন নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে উল্টো মেয়েটিকে দোষারোপ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে পরিবারগুলোর মধ্যে মুখ না খোলার ঘটনা আড়াল করার একটা প্রবণতা রয়েছে। আর পরিবারের ভেতরে খুব কাছের মানুষ দ্বারা যে কন্যাশিশুরা এমন কি ছেলেশিশুরাও নির্যাতনের শিকার হয়। এই বিষয়টি সম্পর্কে অনেক পরিবার ধারনাই রাখে না। যে কারণে তারা শিশুদের সেভাবে নজরদারিও করে না। অথচ নিপীড়নের শিকার এসব শিশু মানসিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে তারা সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠতে পারে না।

পরিবারগুলোকে আমরা অনেক বড় শিক্ষালয় বলছি। কিন্তু পরিবারগুলোতে সন্তানরা কি শিখছে? পরিবারে ছেলেশিশুরা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড় হচ্ছে। বড় হয়ে তারা কন্যাশিশুদের সম্মান করতে, শ্রদ্ধা করতে

পারছে না। কন্যাশিশুদের হয়রানি করছে, উত্ত্যক্ত করছে, নিপীড়ন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে যৌন নিপীড়ণ বা উত্ত্যক্তকরণের বিষয়টি যে ব্যাপক ও সহিংসরূপে দেখা যাচ্ছে, তার একটা বড় সামাজিক কারণ যথাযথ পারিবারিক শিক্ষার অভাব। উত্ত্যক্তকরণ কথাটিকে অনেক সময় লঘূ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এটিকে আর সেভাবে দেখার সুযোগ নেই। এটি একটি অপরাধমূলক কার্যক্রম। সাম্প্রতিক সময়ে নারীর প্রতি ব্যাপক সহিংসতার একটা বড় কারণ সমস্যাও পরিবারের নারীর প্রতি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। এখনও নারীর অবস্থান যথাযথ নয়। সমাজে ও পরিবারে নারীর মর্যাদা নিশ্চিত নয়। এখনও সমাজে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নারী খুব ছোটবেলা থেকেই ঘরে-বাইরে নির্যাতিত হচ্ছে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছে। পরিবারের ছেলেশিশুটি সেটি দেখে বড় হচ্ছে এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তার আচরণে প্রভাব ফেলছে।

পরিবারের অবহেলা আর নেতিবাচক আচরণের ফলে কন্যাশিশু যথাযথভাবে বেড়ে ওঠতে পারে না। তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। বিষন্নতা ও অসহায়তা তাকে বড় কিছু করার ক্ষেত্রে প্রণোদিত করে না। যৌন নিপীড়ণের ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবার মেয়েটিকে দায়ী করে। তার পাশে থাকে না। তাকে সাহস যোগায় না। ফলে মেয়েরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে বেড়ে ওঠতে পারে না। আত্মবিশ্বাস মানুষ পরিবার থেকে অর্জন করে। কাছের, প্রিয় মানুষগুলো ভালোবাসলে শ্রদ্ধা করলে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। অথচ পরিবারগুলোর মধ্যে শিশুদের কথা শোনার, তাদের সমস্যা উপলব্ধি করার প্রবণতা নেই। তারা বিশেষ করে শিশুদের দুর্বল ও নির্ভরশীলতার জায়গায় রেখে দিচ্ছে।

আমাদের এখানে বাবা-মা, অভিভাবকত্ব খুবই ত্রুটিপূর্ণ। অথচ সন্তানের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পজিটিভ প্যারেন্টিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা তাদের কথা শোনা ও মতামতের মূল্য দেয়া। বিষয়গুলো শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। পাশাপাশি বাবা-মার মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টিও জরুরি। আজকাল বাবা-মার সম্পর্কের মধ্যে অনেক জটিলতা। তাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের কিনা এ বিষয়গুলো শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো জরুরি।

কন্যাশিশুর প্রতি মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার সমতা, মূল্যবোধের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেখানে সন্তানদের স্বাভাবিক মেলামেশায় শিক্ষা দিতে হবে। তাদের একে অপরকে সম্মান দেখানোর শিক্ষা দিতে হবে। স্কুল-কলেজের কারিকুলামকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে, যাতে ছেলেরা কন্যাশিশুদের বন্ধু মনে করে, সাথী মনে করে। পাশাপাশি নারীর অবদানকে মূল্যায়ন ও সম্মান করতে শেখাতে হবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাও প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে মানবিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও প্রয়োজন মানবিক শিক্ষা। পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব নেবে। পরিবারগুলোতে সংস্কৃতির চর্চা থাকবে, গান শোনা, সিনেমা দেখা, নাটক দেখা ও বেড়াতে যাওয়া পরিবার এই বিষয়গুলো চর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেবে। মানসিক উন্নতির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকবে ব্যাপক সহশিক্ষা কার্যক্রম। গান, কবিতা ও বিতর্কের মতো ভালো বিষয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যস্ত রাখতে হবে।

দেখা যাচ্ছে ইতিবাচক পরিবেশে বেড়ে ওঠলে ছেলে-মেয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জন্মাবে। কন্যাশিশুরা নিজেদের ভালোবাসতে শিখবে ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে। জীবনে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আত্মবিশ্বাসী কন্যাশিশুটি সাহস মনোবল নিয়ে সেসব মোকাবেলা করতে পারবে। সে জন্য সমাজ ও পরিবারে কন্যাশিশুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। তবে সমাজের, রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে একটি কন্যাশিশু নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজনীতি ও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ

সুতপা বেদজ্ঞ

বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে একটি কন্যাশিশুর টিকে থাকার সংগ্রাম শুরু হয় তার জন্মের পর থেকেই। কন্যাশিশুরা এ সমাজে ধীরে ধীরে নারী হয়ে ওঠে। পদে পদে শৃংখলা অনেকক্ষেত্রেই তার বোধশক্তিকে ভোঁতা করে তোলে। এক অজানা সংশয় আমৃত্যু নারীকে আড়ষ্ট করে রাখে। নারী স্বাধীনতার মানে বুঝতে চায় না। স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে চায় না বা অনেকক্ষেত্রে পারে না। গৎবাঁধা জীবনেই বাঁধা পড়তে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

আমাদের মত বহুধা বিভক্ত সমাজে প্রতিটি মানুষের জীবন কোন না কোন রাজনীতির চালে বন্দী। নারী তার বাইরে বেরোতে পারেনি। রাজনীতির চালই নারীকে একঘেঁয়ে জীবনে বন্দী করে ফেলেছে। রাজনীতিই নারীকে তার সমান সুযোগ, সমান অংশীদারিত্ব থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। রাজনীতি নিশ্চিত করেই জানে যে, অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি ও সামর্থ্য। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ শুধুমাত্র নারীর জন্য নয়, গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি এখনো সকল মহলে গুরুত্ব পায়নি। রাজনীতি বিকশিত হয় রাজনৈতিক দলের চর্চার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে সে চর্চা আর যাই হোক নারী বান্ধব নয়ই। রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি সামগ্রিকভাবে রাজনীতিতে নারীর অবস্থা প্রতিফলিত করে না। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ তখনই বৃদ্ধি পায় যখন নারী রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। সচেতনতাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে টেকসই করতে পারে। আর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় পূর্ণতা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি পর্যায় মাত্র।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে দেখা গেছে, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী সমাজের উন্নয়নের বিষয়টি একটা অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ ও ৬৫ অনুচ্ছেদে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(৪) ধারা তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আওতায় নারীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সাংবিধানিক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

সিডও সনদে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নারীকে গৎবাঁধা ভূমিকায় আবদ্ধকারী সব প্রচলিত আচার, প্রথা, রীতি-নীতি, সংস্কার ও বিধি-বিধান ইত্যাদিকে নির্মূল করার দাবী জানানো হয়েছে এ সনদে। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মত। যুক্তরাষ্ট্রের নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ডেভিড ক্যাম্পবেল ও সহযোগী অধ্যাপক ক্রিস্টিনা ওলব্রিচট তাদের গবেষনায় দেখিয়েছেন, সারা বিশ্বেই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমবর্ধমান। এমনকি পিতা-মাতারাও তাদের মেয়েকে ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখতে চাইছেন। ২০০৬ এ ইন্টার আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক হিসেবে দেখা গেছে, ১০ বছরে ল্যাটিন অমেরিকার বিভিন্ন দেশে নারী সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর সংখ্যা দ্বিগুন হয়েছে এবং এ ধারা এখনো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টিকে নারীর ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রের জন্য অনেকেই ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে নারীর রাজনীতিতে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোটা ব্যবস্থাও একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয়। অনেকেই এই কোটা ব্যবস্থার বিরোধিতা

করেন। এ প্রসঙ্গে কলম্বিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইমা উইলস্ মনে করেন, আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো সম্ভব। ল্যাটিন আমেরিকার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ফলে রাজনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থার চেয়েও দ্রুত বদলাচ্ছে। বিশ্ব নারীর প্রতি পুরোনো গৎবাঁধা ধ্যান-ধারণা পেছনে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশের অবস্থা এ রকম নয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় নারী অগ্রাধিকার না পাওয়ায় সাধারণ আসনে ইউপি থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণ অপ্রতুল। সংরক্ষিত আসনের নামে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে নখদন্তহীন করে তার ছায়া বসিয়ে রাখা হয়েছে। তা আর যাই হোক নারীর অধিকার রক্ষায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে যে রাখতে পারছে না তা আমরা বর্তমান রাজনীতির চালচিত্র বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাই। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৪২ বছরের অধিকাংশ সময়ই বাংলাদেশের সরকার প্রধান ও বিরোধী দলের সরকার পদে আসীন ছিলেন দুই জন নারী। কিন্তু নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে কন্যাশিশুর শিক্ষার হার বেড়েছে, সাথে সাথে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের অনুপাতে নারীর অবস্থান এখনো নগন্য।

নারীর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নারীর সার্বিক ক্ষতায়নের সম্পর্ক

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, রাজনীতি হচ্ছে সমাজের উপরি কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় পূর্নতা নিশ্চিত করতে পারে। অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "বেইজিং কর্ম পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বয়ম্ভরতার প্রয়োজনের উল্লেখ রযেছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ নারীর অগ্রগামিতায় মূল ভূমিকা পালন করবে। নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম অংশগ্রহণ একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত।" নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেয়ার কারণ হচ্ছে, শাসন ব্যবস্থাতেই নীতি-কৌশল নির্ধারিত হয়। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা বলয়ের কাছে থাকলেই কেবল নারী প্রগতির ইস্যুগুলোকে সামনে আনা সম্ভব হয়। বস্তুত বাংলাদেশে নারী রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন। অধ্যাপক মাহামুদা ইসলাম এ সম্পর্কে বলেছেন- "বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। রাজনৈতিক দলগুলো পুরুষসুলভ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে না।"

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এক পরিসংখ্যান ও গবেষণা থেকে দেখা গেছে, যে সব দেশে নারীর রাজনীতি ও নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সংখ্যা বেশি, সে সব দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা তুলনামূলকভাবে কম। যে সকল দেশে নারীরা নির্বাচনী রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত, সংসদে আসন নিয়ে সরকারে ও বিরোধী দলে থাকে এবং যেখানে থাকে না তাদের দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে সব দেশে নারী নেতৃত্ব নারী অধিকার সচেতন ও নারী আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন তারা পার্লামেন্টে নারী ও অবহেলিত মানুষের পক্ষে বেশি ভূমিকা রাখতে পারছেন। এ সকল নির্ভরযোগ্য নারী নেতৃত্বই নারীর অধিকার রক্ষায় সর্বপ্রকার অন্যায় অনিয়ম ও পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারছেন। তাতে উল্লেখ করার মত কিছু ফলও আসছে। এসব পরিসংখ্যান ও গবেষণা থেকে দেখা গেছে, নারীর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ গণতন্ত্র বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। পরিসংখ্যান বলছে, নারীর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ শুধু বেশি মাত্রায় হলেই চলবে না, কোন শ্রেণী থেকে তারা এসেছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কখনো কখনো এই প্রশ্নটিই প্রধান ভূমিকা রাখে। গৎবাঁধা সামাজিক ধারণার পরিবর্তন না হলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক করে তোলা সম্ভব নয়। আবার রাজনীতিতে নারীর

অংশগ্রহণ প্রথাগত ধারণার পরিবর্তন আনতে সহায়ক। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণই প্রথাগত ধারণার ওপর সবচেয়ে বড় এবং প্রথম আঘাত হেনেছে। প্রথম দিকে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা দু'টোই থাকা দরকার। বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটানো সম্ভব নয়। সমাজের অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর একটিকে ছাড়া অন্যটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

নির্বাচন ও নারীর নিজস্ব ভাবনা

নির্বাচনে নারীর ভাবনা বিষয়ক একটি জরিপে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের কাছে নারীদের প্রধান প্রধান প্রত্যাশা হচ্ছে- নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বসবাসের পরিবেশ, সম্পদে নারীর ন্যায্য অধিকার, সংসদে নারীর জন্য অর্ধেক সংখ্যক আসন, সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। জরিপ থেকে দেখা যায়, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধা হচ্ছে- শিক্ষার অভাব, সামাজিক ও ধর্মীয় গৎবাঁধা ধারণার বিধি নিষেধ এবং নারীর পশ্চাদপদতা।

জরিপে নারীর যে প্রত্যাশা প্রকাশ পেয়েছে তা অর্জন করার জন্য প্রথাগত বা ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর করলেই শুধু চলবে না। অনেক ক্ষেত্রে এটা তারা করতে অক্ষম।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রথাগত রাজনীতির সংস্কার

রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (আরপিও) সংশোধন করা হয়েছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। এ আদেশ অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিধানের কথা বলা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের সকল কমিটিতে ন্যুনতম ৩৩ শতাংশ নারী রাখার বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে একেবারে নিম্ন পর্যায়ের কমিটিতে এই বিধি কার্যকর করার বিধানও রাখা হয়েছে। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে তার খুব সামান্যই অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিধি আছে, বিধান আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে- আমাদের দেশের নারীরা সাংগঠনিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বা নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। এ বক্তব্য মেনে নেয়া যায় না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে যেখানে নারীরা সুযোগ পেয়েছে, অধিকার পেয়েছে সেখানেই তারা দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার স্বাক্ষর রেখেছে। আসলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারী নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের মানসিকতা ও পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে না পারলে নারী কখনোই তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

আইন করে হোক আর রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে হোক, যেভাবেই হোক না কেন একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে নারীকে রাজনীতির মূলধারায় আনতেই হবে। অর্থবহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ দরকার। তৃণমূল থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া রাজনীতি ও গণতন্ত্রেও গুনগত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা একটা সার সংক্ষেপে আসতে পারি-

১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। রাজনৈতিক দলগুলো পুরুষসুলভ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে না। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছাড়া নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।
২. নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ তার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের একটি পর্যায় মাত্র।
৩. নারীর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদে তাদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্র বিকাশে অপরিহার্য।
৪. নারী মুক্তি আন্দোলন থেকে উঠে আসা সচেতন নারী নেতৃত্বই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোন শ্রেণী থেকে নারী নেতৃত্ব বেরিয়ে আসছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।
৫. প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রথাগত বা ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর করলেই শুধু চলবে না।
৬. সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ও তাতে সরাসরি নির্বাচন নারী প্রতিনিধিত্বের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক।
৭. রাজনীতিতে ব্যাপকহারে নারীর অংশগ্রহণ গৎবাঁধা সামাজিক ধারণা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং নারী-পুরুষ সমতা বিধানের পথে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটাতে সহায়তা করতে পারে।

এ অবস্থায় করণীয়–

- রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে, বিভিন্ন কমিটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক নারী নেতৃত্ব থাকা বাধ্যতামূলক করা।
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ থাকা সত্ত্বেও সে সকল দল তা অনুসরণ করছেন না, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে দলের নিবন্ধন বাতিল করা।
- নির্বাচনে সাধারণ আসনে অধিক হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর এগিয়ে আসতে হবে।
- নারীর প্রতি গৎবাঁধা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে প্রচার মাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা আছে।
- জাতীয় সংসদে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনের আদল পরিবর্তন করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সাধারণ আসনকেই সংরক্ষিত ঘোষণা করতে হবে, সম-মর্যাদার করতে হবে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিপরিষদে এবং প্রশাসনের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে, প্রয়োজনে সংবিধানে সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা দরকার।

...এভাবেই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও প্রকৃত ক্ষমতায়ন পর্বের সূচনা করতে হবে।

লেখক: **সুতপা বেদজ্ঞ**, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী।

কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ক্ষমতায়নের কৌশলগুলো

সালমা খান

ভূমিকা

১. বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ (১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার), যেখানে ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, প্রায় ১৫ কোটি ২৫ লাখ লোক বাস করে। এদেশে প্রতি ১০০ জন পুরুষের অনুপাতে ১০১ জন নারী বাস করেন।

২. উইকিপিডিয়া থেকে পাওয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করার দাবি করতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা (সিপিআর) ১৯৭৫ সালের ৮.৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৫০% সিপিআর-এ উন্নীত হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, দেশের জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের ৬১ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এদের মধ্যে ৫ দশমিক ২ শতাংশ দম্পতি স্থায়ী এবং বাকিরা অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। নারীরাই এই ক্ষেত্রে এগিয়ে। পুরুষদের মধ্যে মাত্র ০.৬ শতাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

৩. এতদসত্ত্বেও দেশের বর্তমান সদ্যসদের ওপর জনসংখ্যার চাপ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অধিক জনসংখ্যা এখনও দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশংকা খুবই বেশি, কারণ বিবিএস এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ৭ কোটি ২০ লক্ষ হচ্ছে ১ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক।

৪. বাংলাদেশের অর্থনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দারিদ্র্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১০ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এর মধ্যে ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ অতিদরিদ্র বা হতদরিদ্র। আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের ৫৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে ছিল। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালে তা কমিয়ে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশে আনার

লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত এক দশকের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশ্বব্যাংক মনে করছে, নির্ধারিত সময়ের দুই বছর আগেই চলতি বছরের শেষ নাগাদ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে বাংলাদেশ।

৫. ইউএনএফপি এর 'বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি-২০১১' প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ৭২ শতাংশ মানুষ এখন গ্রামে বাস করে এবং এদের অধিকাংশই নারী। দারিদ্র্য সারা দেশেই বিস্তৃত যদিও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগী ভূমিকার কারণে দারিদ্র্যের সূচকের নিম্নমুখী গতিধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতিধারায় যেসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা কষ্টকর, তাদের হিসেবের বাইরেই রাখা হয়।

৬. সরকারের বিভিন্ন সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারী ও শিশুরা, বিশেষ করে যাঁরা দরিদ্র পরিবারের সদস্য, এখনও লিঙ্গ-বৈষম্য এবং তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। শিক্ষা, উপার্জন, সম্পত্তির মালিকানা ও স্বাস্থ্য-সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্যই এর কারণ।

৭. সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য এবং নারীর নিম্ন সামাজিক অবস্থানের কারণে শিশুদের বেঁচে থাকা এবং অগ্রগতি অর্জনও তাদের জীবনচক্রের পুরো সময় জুড়েই হুমকির মুখে রয়েছে। ২০১০ সালে পরিচালিত 'বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ' মতে, দেশে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি এক লাখে ১৯৪ জন। ২০০১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩২২ জন। অর্থাৎ গত এক দশকে মাতৃমৃত্যুর হার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আর ২০১১ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৩ জন। ১৯৯৩-৯৪ সালে ছিল ১৩৩ জন। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে ৬০ শতাংশ। লিঙ্গ-বৈষম্য, অবহেলা এবং অপর্যাপ্ত যত্ন তাঁদের বেঁচে থাকা এবং অগ্রগতিকে প্রভাবান্বিত করে। অপুষ্টিতেও কন্যাশিশুরাই বেশি ভোগে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ছেলেদের ৭৫% এবং মেয়েদের ৮৩% রক্ত শূন্যতায় ভোগে।

কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য

৮. বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশান অনুসারে, প্রজনন স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা, আর এর অর্থ একজন নারীর পরিপূর্ণ ও নিরাপদ যৌন জীবন এবং সন্তান লাভের ক্ষেত্রে তাঁর একক সিদ্ধান্ত এবং পছন্দ করার ক্ষমতা বা অধিকার। স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জনের আনন্দ লাভের অধিকার নারীদের ক্ষেত্রে তাঁদের পুরো জীবন-চক্রে অবশ্যই পুরুষদের মতোই হতে হবে।

৯. বাংলাদেশসহ বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে প্রজনন অধিকারের কথা বিবেচনায় না রেখেই কন্যাশিশুদের অল্প বয়সে বিয়ে, মাতৃত্ব ও সন্তান উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগই ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরী। তাদের মধ্যে ৬৬ ভাগের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। তাদের মধ্যে আবার ৬৪.৩ ভাগ কিশোরী অবস্থাতেই গর্ভধারণ করেন। সেই হিসেবে দেশে প্রতি বছর ১ কোটি ৬০ লাখ কিশোরী সন্তানের জন্ম দেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ২০-২৪ বছরের গর্ভবতী মায়েদের যে মাত্রায় প্রসবজনিত জটিলতার ঝুঁকি থাকে, তার পাঁচ গুণ ঝুঁকি থাকে ১০-১৪ বছরের কিশোরীদের বেলায়। ২০ থেকে ২৯ বছর বয়সে সন্তান জন্মদানকারী মায়ের তুলনায় ২০ বছরের কম বয়সে সন্তান জন্মদানকারী মায়েরা ৫০ শতাংশ মৃত শিশুর জন্ম দেন। অন্যদিক পুত্র-সন্তানের অগ্রধিকারের কারণে নারীদের প্রতি বৈষম্যের ফলে প্রায়ই তাঁরা

খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং এরই ফলশ্রুতিতে নারী শিশুরা সম্পূর্ণভাবে প্রজনন অধিকারহীনতা নিয়েই কিশোরী বয়সে উপনীত হন। এঁরাই বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের অভাবের কারণে যৌন-জীবন ও সন্তান-উৎপাদন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য-ঝুঁকির মুখোমুখি হন এবং বিশেষভাবে এর শিকার হন।

১০. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের অবস্থাকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত: তথ্যের অভাব এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির কারণে দেশে বিদ্যমান অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা থেকে নারীরা আরও বেশি পরিমাণে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত: তাঁরা এমন অনেক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন যেগুলো একান্তভাবে নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং যেগুলো তাঁদের বিরুদ্ধে সতত ক্রিয়াশীল বৈষম্য এবং সন্তান উৎপাদনে তাঁদের ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত।

১০. কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর লিঙ্গ পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব

কিশোর-কিশোরীরা তাঁদের জীবনচক্রে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার কারণে দারিদ্র্য ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কিশোরীরা কিশোরদের তুলনায় ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এমনকি তাঁদের নিজস্ব পরিবার ও সমাজের মধ্যেও তাঁরা অধিকতর অরক্ষিত থাকেন।

ক) পুত্র-সন্তানের অগ্রাধিকার

পুত্র-সন্তানই অধিক পছন্দ- এই মানসিকতা বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশেই ব্যাপিত। কন্যাশিশুর প্রতি অবহেলার কারণে তাঁদের নানা রকম অসুখ ও মৃত্যুর সামাজিক প্রভাব এইসব দেশের পুরুষ ও নারীর ক্ষতিকর অনুপাতের মধ্যেই প্রকাশিত। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৯৯০ সালে প্রথম ভারতে হারিয়ে যাওয়া নারীদের কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, গত কয়েক বছরে ভারত এবং চিন থেকে দশ কোটি নারী হারিয়ে গিয়েছেন। অমর্ত্য সেনের গবেষণার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ সিয়ান অ্যান্ডারসন এবং দেবরাজ রায় ভারতের হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের ওপর একটি বিশেষ গবেষণাপত্র ২০১২ সালের মার্চ মাসে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন। সেখানে বলা হয়, বছরে কুড়ি লাখ নারী ভারত থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছেন।

২০১১ সালে ভারতের সর্বশেষতম জনগণনার প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, শিশুকন্যার জন্মের হার শিশুপুত্রের তুলনায় ক্রমশ কমছে। ২০১১ সালে প্রতি এক হাজার শিশুপুত্রের অনুপাতে ৯১৪ জন শিশুকন্যা জন্মগ্রহণ করেছে। উধাও হয়ে যাওয়া এসব নারীরা ভ্রূণ হত্যা, শিশু হত্যা, বিশেষভাবে নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত এবং আরও বিভিন্ন রকম লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের ও উৎপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

খ) মেয়েদের জন্য অপর্যাপ্ত খাদ্য ও দুর্বল পুষ্টি

খাদ্য বিতরণ, গৃহকাজের চাপ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা সেবা এবং শিক্ষা ও বিনোদন লাভের সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের মূল এই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। গ্রামাঞ্চলের পরিবারে কিশোরীদের অবমূল্যায়নের কারণে এদের মধ্যে অপুষ্টি একটি সমস্যা হিসেবে থেকেই যাচ্ছে। জাতীয় পুষ্টি জরিপের (২০১১ সাল) তথ্য অনুযায়ী, সমগ্র কৈশোর বয়সে ছেলেদের তুলনায় কন্যাশিশুরা কম ক্যালরি ভোগ করে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কন্যাশিশুরা ১৬ শতাংশ কম ক্যালরি পায়। আবার ছেলেদের চেয়ে ৫-১৪ বছরের কন্যাশিশু ১১ ভাগ কম ক্যালরি গ্রহণ করে। ১০-১২ বছর বয়সকালে ৮ শতাংশ, ১৩-১৫ বছর বয়সকালে ১৮ শতাংশ এবং ১৬-১৯ বছর বয়সকালে ২৮ শতাংশ কম শক্তিদায়ক খাদ্য পায় কন্যাশিশুরারা। এ ছাড়া ১২-১৬ বছর বয়সী

কন্যাশিশুদের প্রায় ১২ শতাংশ ভিটামিন এ ঘাটতিতে ভোগে এবং ১২-১৫ বছর বয়সী কন্যাশিশুরা আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এভাবে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি অবহেলার কারণে ১-৪ বছরের কন্যাশিশুর মৃত্যুহার ওই বয়সী ছেলেশিশুর চেয়ে ২৭ ভাগ বেশি। তাছাড়া প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ১০-১২ বছর বয়সী ৫৪ ভাগ এবং ১৩-১৭ বছরের ৫৭ ভাগ কন্যাশিশুর স্বাভাবিক দৈহিক বিকাশ ব্যাহত হয়। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের তুলনায় ছেলেশিশুরা ৬৭ শতাংশ বেশি স্বাস্থ্যসেবা পায়।

গ) সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সাথে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নের সম্পর্ক

কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাব, মেয়েদের বয়ঃসন্ধি এবং মাসিক রক্তক্ষরণের প্রতি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রচলিত রীতি-নিয়ম ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মাসিক রক্তক্ষরণের শুরু থেকে মেয়েদের অপবিত্র এবং কলুষিত মনে করা হয় এবং সে কারণে তাদের সমাজের বিভিন্ন স্বাভাবিক কাজে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। মাসিক রক্তক্ষরণকে ঘিরে গোপনীয়তার কারণে নারীকে সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণ এবং ঐ নারীর প্রতি পারিবারিক সহায়তার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই নারীর প্রজননতন্ত্রে জীবাণুর সংক্রমণ এবং অন্যান্য নারী ঘটিত রোগের সৃষ্টি করে। জীবাণু সংক্রমণের ফলে পচনজনিত গর্ভপাতসহ নারীর প্রতি নানা ধরনের উৎপীড়ন এবং আত্মহত্যা এক তৃতীয়াংশ কিশোরী মৃত্যুর কারণ।

ঘ) যৌন নির্যাতন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের অভাব

নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান সহিসংতা এবং অন্যান্য ধরনের যৌন নিপীড়ন হলো অসম লিঙ্গ সম্পর্কের পরিনামে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীরাই বিশেষত পরিবারের ভিতরে ও বাইরে যৌন নির্যাতনের শিকার হন। যেসব দেশের নারীরা সর্বোচ্চ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন, বাংলাদেশ তার অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে (২০১৩ সাল) বলা হয়েছে, বাংলাদেশ, পূর্ব তিমুর, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডে ৩৭.৭ শতাংশ নারী পারিবারিকভাবে নির্যাতিত হন। বিশ্বের মোট ৮১টি দেশে জরিপ চালিয়ে পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতনের এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। জাতিসংঘের এ সংস্থা নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতার জন্য ট্যাবুকে বা সামাজিক নিষেধাজ্ঞা জাতীয় লোকাচারকে দায়ী করে বলেছে– এ ধরনের নানাবিধ প্রচলিত প্রথার কারণে নারী-পুরুষ উভয়ই মনে করে, নারীর প্রতি নির্যাতন একটি স্বাভাবিক বিষয়।

ঙ) এইচআইভি/এইডস এবং বয়ঃসন্ধিকাল

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা এক হাজার ১০১ জন। সেই সঙ্গে বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এক বছরে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৪ জন মারা গেছেন। ইউনিসেফ এর এক সমীক্ষায় অনুযায়ী, এশিয়া মহাদেশের শিশু এবং কিশোরীদের বেশিরভাগই এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সেই কারণে তারা এই অঞ্চলে এই অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ক্রমবর্ধমান আশংকা সম্পর্কে 'দুঃখজনকভাবে অপ্রস্তুত'। সমীক্ষায় জানা যায়, ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সের ৬০% এবং ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের ২৫% শিশু-কিশোর-কিশোরীই এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে "কিছুই" জানে না। প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং রীতি-রেওয়াজ, যৌন আচরণ সম্পর্কে বয়ঃসন্ধিকালের এই কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত পছন্দে জ্ঞান লাভের অধিকার অসম্ভব করে তুলেছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের যৌন-ঝুঁকি এবং এইচআইভি/এইডস মহামারী ও অন্যান্য যৌন রোগের পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখেন না।

চ) অধিকারবিহীন কিশোরীরা

বেশিরভাগ কিশোরীরাই পরিবারে বা সমাজে তাদের অধিকার সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। যদিও প্রায় সকল এশিয় দেশেই শিশু অধিকার এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত দলিলে (সিডও) সম্মতি দিয়েছে, যা রাষ্ট্রগুলোকে শিশু এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের যে কোন ধরনের শোষণ ও যৌন নিপীড়ন থেকে রক্ষা করায় এবং শিশুদের পিতামাতা বা আইনতঃ অভিভাবককে শিশুদের প্রতি যে কোন ধরনের শোষণমূলক আচরণ বন্ধে সহায়তা দিতে দায়বদ্ধ করেছে।

১১.তথ্য-সংগ্রহের সমস্যাবলী

অবশ্য পরিবারের মধ্যে বা গৃহে যৌন নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ খুবই কঠিন, কারণ এই বিষয়ে কোন সচেতনতা বা নির্যাতনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণের কোন সুযোগ নেই। একটি জরিপ (থিরেসি বানচে, হারিয়ে যাওয়া সরলতা, চুরি হয়ে যাওয়া ছেলেবেলা, ইউপিএল) অনুসারে, জিজ্ঞাসাবাদ করা ৭১ জন গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত শিশুর মধ্যে ২৩.৫% বলে যে, তারা যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, (কর্মজীবী শিশুদের দৈনন্দিন জীবন, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯৭) ২০০,০০০ থেকে এক মিলিয়ন শিশু গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত এবং বেশিরভাগই দুর্ব্যবহার, শারীরিক নির্যাতনের শিকার।

লেখক: সালমা খান, নির্বাহী সদস্য-উইমেন ফর উইমেন, ভূতপূর্ব চেয়ারপারসন ও বর্তমান সদস্য-জাতিসংঘ সিডও কমিটি।

দিগন্ত ছুঁতে চায় মেয়েশিশুরা

সেলিনা হোসেন

২০১২ সালের মেয়েশিশু দিবসে প্রতিপাদ্য ছিল 'মেয়েশিশুদের অগ্রগতি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'। এই প্রতিপাদ্যকে শুধু একটি বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। এটি একটা বড় কথা। দেশের সমৃদ্ধির প্রশ্নটি জাতির একটি অংশকে বাদ দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়। অগ্রগতির মানে এই নয়, তা শুধু পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবস্থা। নারী সমাজের একটি প্রধান অংশ। নারীর হাতে পরিচর্যা পায় শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, মানসিক বিকাশ এবং মূল্যবোধের নৈতিকতা। এসব গুণ দিয়ে নারীই পারে একজন পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলতে। তার এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাই একটি সমাজের চালিকাশক্তি। সমাজ যদি দুর্নীতিবাজের আখড়ায় পরিণত হয় তবে সে সমাজের অগ্রগতি পিছিয়ে থাকে। সমাজ যদি সন্ত্রাসীর পায়ের নিচে কুঁকড়ে যায়, তবে সে সমাজের অগ্রগতি নিশ্চিহ্ন হয়। সমাজ যদি বোধ ও মেধাশূন্য হয় তাহলে সে সমাজ কোনও সমাজই নয়। সে সমাজ বর্বরতা ও হিংস্রতা ইত্যাদি নানাবিধ শব্দের একটি জায়গা হয়। এটা কারোরই কাম্য নয়।

আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এখন পর্যন্ত এমন সমাজের মধ্যে পড়িনি। আমাদের সামনে অনেকখানি তল অবশিষ্ট আছে। আমরা সেটুকু অবলম্বন করে এগুতে চাই। সেজন্য 'মেয়েশিশুর অগ্রগতি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' শুধু মুখের কথা নয়, এটি একটি অঙ্গীকারও বটে। এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য সরকারের নানা ধরনের উদ্যোগ আমাদের প্রত্যাশার জায়গা পূরণ করবে বলে আমরা আশাবাদী হয়ে দিন গুণি। মেয়েশিশুর শিক্ষার বিষয়টি সরকার যেভাবে দেখছে তা নাগরিক সমাজকে সমাজ-পরিবর্তনের ধারণায় আশাবাদী করে তুলছে। সরকার শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে মেয়েশিশুদের শিক্ষার হার বাড়িয়েছে। বছরের প্রথম দিন শিশুদের হাতে বই তুলে দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দেয়া হচ্ছে শিশুদের।

এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের মেয়েশিশুদের শিক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে বেশ খানিকটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে 'আসমানী' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সে কবিতার শুরুর কয়েকটি লাইন এমন– 'আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও/ রহিমদ্দির ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও/ বাড়ী তো নয় পাখির বাসা - ভেন্নপাতার ছানি/ একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি/ একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে,/ তারির তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে।' দু-তিন বছর আগে পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখলাম আসমানী ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে তার গ্রামের নিজবাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

পল্লীকবির কবিতায় আসমানীর দারিদ্র্য যে প্রবলভাবে বিধৃত হয়েছে সেখানে মেয়েশিশু হিসেবে তার স্কুলে যাওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। সে সময়ের অস্বচ্ছল পরিবারগুলোতে মেয়েশিশুর শিক্ষার ব্যাপারটি কোনভাবেই বিবেচিত হতো না। আসমানী নিরক্ষর ছিলেন কিনা আমরা জানি না। কোনভাবে তার পড়ালেখার সুযোগ হয়েছিল কি না আমরা জানি না। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের এইসব আসমানীর জীবনে খানিকটুকু সেবা জুটেছে। কিছুটা স্বস্তিময় জীবনযাপন করেছেন সংসদ সদস্য এবং জেলা প্রশাসকের আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণের কারণে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ২০১২ সালের বাংলাদেশের মেয়েশিশুদের পরিচর্যা ও নিরাপত্তা অনেকখানি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানুষের দৃষ্টিতে এসেছে। জেন্ডার বিষয়টি সাধারণের মনে খানিকটুকু হলেও সচেতনতার প্রভাব পড়েছে। এভাবেই বাংলাদেশের মেয়েশিশুর শিক্ষার অগ্রগতি আজকের সময়ের আলোচনার বিষয়।

এখানে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চাই। বরগুনা এলাকার সকল উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী ১৮৫ জন মেয়ে শিক্ষার্থীদের বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার ফিস মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন প্রদান করে। ফিসের টাকা পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন :

ক) শিক্ষার্থী অবিবাহিত মর্মে প্রধান শিক্ষকের নিশ্চয়তা পত্র;

খ) শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রী, সাধারণত সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার জন্য মনোনীত হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন পত্র;

গ) শিক্ষার্থীর অভিভাবক গরীব এবং মেয়েটিকে পড়াতে আগ্রহী মর্মে প্রত্যয়ন পত্র;

ঘ) অভিভাবকের পক্ষ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা যে, তার মেয়েটিকে বাল্যবিবাহের বলিতে পরিণত হতে হবে না;

ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশনের চলমান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বর্তমান কার্যক্রমটি শুরু করার দ্বিতীয় বছরে অর্জিত ফলাফল লক্ষণীয়। ধারাটি অব্যাহত থাকলে এ' থেকে একটি টেকসই ফলাফল অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশার জায়গা তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়।

এস.এস.সি পরীক্ষার ফিস প্রাপ্ত মেয়ে শিক্ষার্থী মোট ১শ' ৮৫ জন বরগুনা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের প্রতিটি ইউনিয়নের কমপক্ষে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যক্রমের আওতার অন্তর্ভুক্ত। ২০১৩ সালের পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১শ' ৮৫ জন মেয়ের মধ্যে ১শ' ৭৩ জন পাস করেছে। এরমধ্যে ১শ' ৭৩ জনই বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছে। যে ১২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি তারা আবার পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। অবিশ্বাস্য সত্য যে কোনো একজন মেয়েশিশুও শিশুবিবাহর শিকার হয়নি। এটি একটি উদাহরণ মাত্র।
দেশজুড়ে এমন আরও উদাহরণ অবশ্যই আছে। শিক্ষার সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের এই দিকগুলো যুক্ত হলে দ্রুতই সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যের হার কমবে। এমন প্রত্যাশা নিয়ে যে যেখানে আছেন কাজ করলে প্রত্যাশার স্বপ্ন দ্রুত পূরণ হবে। 'মেয়েশিশুর অগ্রগতি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' শুধু একটি স্লোগান মাত্র নয়। এটি একটি দিকদর্শন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার 'মতিচূর' গ্রন্থে 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কী করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত মেয়ে হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।... ভারতে বর দুর্লভ বলিয়া মেয়েদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? মেয়েগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্ন-বস্ত্র উপার্জন করুক।'

এখন থেকে একশ' বছর আগে অতি স্পষ্টভাবে এই সত্য উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। যতদিন মেয়েশিশুরা শিক্ষিত হয়ে অন্ন-বস্ত্র উপার্জন করতে না পারবে ততদিন তাদের মুক্তি নেই। বাবা-মা যদি মেয়েশিশুদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত করে তবেই সামাজিক সমস্যাগুলো দূর হতে পারে। যে যৌতুকের শিকার হয় মেয়েশিশুরা, তখন এই যৌতুকের প্রশ্ন ওঠবে না। মেয়েশিশুদের উপার্জন থাকলে সেটাই হবে তার বেঁচে থাকার বর্ম। মেয়েশিশুরা যত বেশি শিক্ষিত হবে, তত দ্রুত সমাজের বৈষম্য এবং অনাচার দূর হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েশিশুর সংখ্যা বেশি। কিন্তু এটাও পাশাপাশি পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পায়। মূলত মেয়েশিশুদের ঝরে পড়ার সংখ্যা পরবর্তী সময়ে বেশি দেখা দেয়। যেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়েশিশুদের শিক্ষার হার এখন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে কম। তারপরেও বলব, আগের চেয়ে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সামাজিকভাবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন এসেছে।

বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানের ১৬ বছর বয়সী কিশোরী মালালা ইউসুফজাই আজ মেয়েশিশুর শিক্ষার অধিকারের রোল মডেল। শিক্ষার অধিকারের জন্য লড়াইয়ের কারণে মালালা তালেবানদের নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকার হয়। ২০১২ সালের অক্টোবরে তারা তাকে তার স্কুলের বাসে গুলিবিদ্ধ করে আহত করে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে মালালা সুস্থ হয়। ২০১৩ সালের ১২ জুলাই মালালার জন্মদিনে জাতিসংঘের মহাসচিব তাকে জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মালালা যে ভাষণ দেয় তা বিশ্বের মানুষের কাছে তার শক্তির সৌন্দর্যের বার্তা নিয়ে পৌঁছে যায়। এখানে মালালার ভাষণের কয়েকটি উক্তি উঠিয়ে দিচ্ছি:

- "মালালা দিবস কেবল আমার দিন নয়। এ দিন পৃথিবীর প্রতিটি নারীর, প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ের, যারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে।
- আমি আজ এখানে দাঁড়িয়েছি অনেকের মধ্যে একজন হয়ে, নিজের কথা বলতে নয়, যারা বলতে পারে না তাদের কথা শোনানোর জন্য। তাদের জন্য, যারা অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছে- শান্তিতে জীবনযাপন করার অধিকার, সম্মান পাওয়ার অধিকার, সমান অধিকারের সুযোগ পাওয়ার এবং শিক্ষিত হওয়ার অধিকার।
- উগ্রপন্থিরা ভেবেছিল আমার লক্ষ্য থেমে যাবে। এ রকম কিছুই হয়নি বরং আমার সব দুর্বলতা, ভয়, আশাহীনতার মৃত্যু হয়েছে। আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে শক্তি, ক্ষমতা এবং সাহস।
- তালেবান কিংবা অন্য কোনো চরমপন্থি গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এখানে এসে দাঁড়াইনি। আমি প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকারের কথা বলতে এসেছি। আমি চাই, তালেবানসহ অন্য চরমপন্থিদের ছেলে এবং মেয়েশিশুরাও শিক্ষিত হোক।
- যে ব্যক্তিটি আমাকে গুলি করেছে আমি তাকে ঘৃণা করি না। এমন যদি হতো আমার হাতে বন্দুক থাকত এবং সে আমার সামনে থাকত, তাহলেও আমি তাকে গুলি করতাম না। এটাই হচ্ছে করুণা, যা আমি করুণার নবী মুহাম্মদ (সাঃ), যিশুখ্রিষ্ট এবং গৌতম বুদ্ধের কাছ থেকে শিখেছি। এটাই হচ্ছে পরিবর্তন, যা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছ থেকে। এটা হচ্ছে শান্তির দর্শন, যা আমি শিখেছি গান্ধী, বাছা খান এবং মাদার তেরেসার কাছ থেকে। এবং এটাই হচ্ছে ক্ষমা - যা আমি শিখেছি আমার বাবা এবং মায়ের কাছ থেকে। আমার অন্তর আমাকে এটাই বলে যে, শান্তিতে থাক এবং সবাইকে ভালোবাস।

- আমরা তখনই আলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করি যখন আমরা অন্ধকার দেখি। আমরা আমাদের কণ্ঠের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি তখন, যখন আমাদের চুপ থাকতে হয়। তেমনিভাবে আমরা যখন উত্তর পাকিস্তানের সোয়াতে ছিলাম, তখন বন্দুক দেখে উপলব্ধি করেছিলাম কলম এবং বইয়ের গুরুত্ব।
- চরমপন্থিরা কলম এবং বইকে ভয় পায়। তারা শিক্ষার ক্ষমতাকে ভয় পায়। তারা ভয় পায় নারী কণ্ঠের শক্তিকে।
- আজ বিশ্বের সব নেতার কাছে আবেদন জানাই তাদের কূটনীতিক কৌশলগুলো শান্তি এবং সাফল্যের স্বপক্ষে বদলে নেওয়ার জন্য। আবেদন জানাতে চাই- যেন তাদের সমস্ত চুক্তিতে নারী এবং শিশুর অধিকার রক্ষিত হয়।"

মাত্র কয়েকদিন আগে, জুলাই মাসের ৮ তারিখে একটি ঘটনা ঘটে মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে। ঘটনা ঘটিয়েছে ১১ বছরের কিশোরী নাদা-আল-আহলাদ (Nada-Al-Ahlad)। তাঁকে জোর করে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল তার মা। মেয়েটি সেই বিয়ে থেকে পালাতে সক্ষম হয়। তাকে সহযোগিতা করে তার চাচা। গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে নাদা বলেছে, বিয়ে হলে I would have had no life, no education. এই বালিকা বয়সে নাদা কঠোরভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। বলেছে, আমি বিক্রি করার পণ্য নই। আমি মানুষ। এই বয়সে বিয়ে হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো। (I am not an item for sale. I am a human being and I would rather die than get married at this stage.)

বাংলাদেশে এমন সাহসী মেয়েশিশুরা আছে। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর বিশ্বের দরবারে পৌঁছায় না। এ দেশের মেয়েশিশুরা স্কুলে যাওয়ার জন্য তাদের সরব ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। বাবা-মায়ের কাছ থেকে নিজেদের উচ্চশিক্ষার অধিকার আদায় করে। এ দেশের কিশোরীরাও সাহসের সঙ্গে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সাহসের সঙ্গে যৌতুকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিয়ের আসর থেকে উঠে যায়। সমাজ বদলের এইসব দিক বাংলাদেশের মেয়েশিশুদের সামনে জেন্ডার ইকুইটি ও ইকুয়ালিটির স্বপ্ন।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত সমাজব্যবস্থায় জেন্ডার সমতার ধারাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তরুণদের মধ্যেও দেখা যায়। বাংলাদেশের একজন তরুণ ২০১৩ সালে 'ইয়ুথ কারেজ অ্যাওয়ার্ড ফর এডুকেশন (youth courage Award for Education) লাভ করে। প্রতি বছর জাতিসংঘ এই পুরস্কার প্রদান করে। এ বছর এই পুরস্কারের জন্য বিশ্বের সব দেশ থেকে সাত জনকে বাছাই করেছে জাতিসংঘ। এই সাত জনের একজন বাংলাদেশের কেশব রায়। জাতিসংঘের শিক্ষাবিষয়ক বিশেষ দূত ও সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর লেখা চিঠি আসে কেশব রায়ের কাছে। তিনি লিখেছেন, 'প্রতিটি ছেলেমেয়ের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে তুমি অবদান রেখেছ। এর স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা তোমাকে তরুণদের জন্য অনুসরণীয় একজন নেতা হিসেবে মনোনীত করেছি। তোমাকে অভিনন্দন।'

হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান কেশব রায়কে বাবার অসুস্থতার কারণে ছাড়তে হয়েছিল স্কুল। মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ভাণ্ডারির দোকানে কাজ নিয়ে সংসারের হাল ধরেছিল। বাবা সুস্থ হয়ে উঠলে কেশব নিজের বেতনের টাকায় বইখাতা কিনে আবার স্কুলে ভর্তি হয়। শুরু হয় পড়ালেখার জীবন। কেশব এই বছর জলঢাকা বিএমআই কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

স্কুলজীবন থেকেই ও এলাকার শিশু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার শিশুদলের সঙ্গে নানা ধরনের কাজ করতে শুরু করে। তার সাহস এবং আগ্রহের শেষ

ছিল না। শিশুদের শিক্ষার অধিকার, বাল্যবিবাহ বন্ধসহ নানা ধরনের সামাজিক কাজ করতে ওর কোনো দ্বিধা ছিল না। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার সময় প্রতিরোধের মুখে পড়লে ছুটে যেত বড়দের কাছে। এমন কথাও বড়দের কাছে অনেক সময় শুনেছে যে, 'তুই বিয়ে বন্ধ করতে আসছিস, পরে কিন্তু তোকে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।' এমন ধমকের মুখে পিছিয়ে যায়নি কেশব। উপজেলার প্রায় পঁচিশটির মতো বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে ও। আর স্কুল থেকে ঝরেপড়া প্রায় পঞ্চাশটি শিশুকে আবার স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। এমন উদ্যোগী তরুণ সমাজের নারী-পুরুষ সমতার জন্য সবচেয়ে প্রাণবন্ত মানুষ। আমাদের চারপাশে এমন তরুণরা আছে। তারাই ঠিক রেখেছে সমাজের ভারসাম্য। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েশিশুরাও এগিয়ে আসছে নিজেদের অবস্থানের জায়গাটি শক্ত করার জন্য।

মেয়েশিশুর অগ্রগতি দেশের সমৃদ্ধির জন্য যে অনিবার্য, সেটা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সবাইকে বুঝতে হবে। এটা যেন শুধু স্লোগান সর্বস্ব না হয়। সরকারি-বেসরকারি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের এই উপলব্ধি এখন খুব জরুরি।

দুই-তিন বছর আগে সমাজসেবী, নারীনেত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ উইমেন্স কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান যশোধারা বাগচী বাংলাদেশের মেয়েশিশুর শিক্ষা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'আমি ঢাকায় এসেছি, ঢাকার আশপাশের গ্রামগুলোতে মেয়েশিশুদের শিক্ষার পরিস্থিতি দেখার জন্য। আমি দেখে খুশি হয়েছি, এখানকার গ্রামগুলোতে ভোরবেলায় মেয়েশিশুরা দল বেঁধে স্কুলে যায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এমন দৃশ্য খুব সহজে দেখা যায় না। আমরা আপনাদের চেয়ে পিছিয়ে আছি।'

সেদিন তার এই কথা শুনতে খুব ভালো লেগেছিল। আমাদের প্রত্যাশা – মেয়েশিশুর অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমরা যেন শিক্ষার এই জায়গাটি ধরে রাখতে পারি। শতভাগ মেয়েশিশু শিক্ষিত হবে এটা হোক প্রত্যাশার জায়গা। আমাদের সমাজে একজন - দু'জন দৃষ্টান্ত হবে না। রুখবে সবাই। সকলের সম্মিলিত শক্তি একটি বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে থাকবে।

লেখকঃ সেলিনা হোসেন, লেখক ও কথাসাহিত্যিক।

নেশা থেকে অপরাধঃ বিপথ অথবা বিপদগামী কন্যাশিশু

সোমা দেব

গত কয়েকদিন ধরেই একটি ঘটনা তথা সংবাদ বেশ আলোচিত হচ্ছে। তা হচ্ছে স্ত্রীসহ পুলিশ পরিদর্শক খুন হওয়া এবং পরবর্তীতে তাদের কন্যা ঐশীর আত্মসমর্পণ এবং স্বীকারোক্তি। খবরটি পড়ে সবার মতো আমিও স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং তার চেয়েও বেশি আতঙ্কিত। যদিও কন্যাটি দোষী নাকি নির্দোষ, এই বিষয়টি এখনও আইনের দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয়নি। পুলিশ কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছে তা যদি আমরা পুরোপুরি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি, যদি ঐশীর স্বীকারোক্তিকে সত্য তথ্য বলে ধরে নেই, তাহলে যে বিষয়টি এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, সেটার চিত্র খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যা সামাজিক অবক্ষয় এবং অপরাধের এক নতুন এবং চরম উদাহরণ।

প্রথমত আমার মাথায় যে বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছে তা হলো, যে কন্যাটি বিপথে পা বাড়ালো, নেশার জগতে পা বাড়ালো, তার দায় কার? শুধুমাত্র বাবা-মা কিংবা অভিভাবক মহলের? এই ঘটনাটির দায় কি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র কি এড়িয়ে যেতে পারবে? অথবা মিডিয়াও কি এই দায় এড়িয়ে যেতে পারবে? একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর প্রিন্ট অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া এই ইয়াবা নামক নেশাজাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে যত তথ্য দিয়েছেন, আমাদেরকে যতভাবে অবহিত করেছেন, সেটা কি অনেক আগেই তারা করতে পারতেন না?

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (ইউএনওডিসি) থেকে প্রকাশিত বিশ্ব মাদক প্রতিবেদন-২০১৩ এ বলা হয়েছে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে এক লাখ ৩০ হাজার, ২০১০ সালে আট লাখ ১২ হাজার এবং ২০১১ সালে ১৪ লাখ ইয়াবা বড়ি ধরা পড়ে। এমনকি মিয়ানমারের আশেপাশের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে ইয়াবা উদ্ধারের সংখ্যা সবচেয়ে কম। পুলিশ এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যত পরিমাণ ইয়াবা এই দেশে ধরা পড়ে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি পরিমাণে ইয়াবা দেশে ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সীমান্তেই এর প্রবেশ রোধ করা জরুরি (*প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট, ২০১৩)।

তথ্যটি খুবই ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, যখন একটি ঘটনা ঘটে তখন আমরা খুব বেশি সচেতন হই কিন্তু কয়েকদিন পর আবার একই অবস্থা। দুই বছরের ব্যবধানে প্রায় ১৩ লাখ ইয়াবা বড়ি বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কারা এর সাথে জড়িত? তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেয়া হয়েছে- এমন কোন প্রতিবেদন কি আমরা পত্রিকার পাতায় দেখতে পাই? বাংলাদেশে ইয়াবা প্রবেশের সাথে যারা যুক্ত, তাদের ছেলেমেয়েরাই হয়তোবা এই ভয়াবহ মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছেন।

সম্প্রতি প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের (আপন) চিকিৎসা ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, সেখানে চিকিৎসা নিতে আসা মাদকাসক্ত কিশোরীদের সবাই ইয়াবাতে আসক্ত। এদের বেশিরভাগই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রী। তাই কোন হতাশা থেকে বা কী কারণে কন্যাশিশুরা ইয়াবা নামক এই নেশার সাথে যুক্ত হচ্ছেন, তার তদারকি করা দরকার। এটা প্রথমত করতে হবে পরিবারকেই।

নৃশংসতম ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর হয়তো অনেক পিতামাতা-ই নড়েচড়ে বসবেন। হয়তো অনেকেই তাদের সন্তানরা কোথায় যাচ্ছে, প্রাইভেট পড়ার নাম করে টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে বা কত টাকা কী খাতে খরচ করছে, সেই বিষয়টিও ভাববেন। কিন্তু সমাজে নেশার বিষবাষ্প ইয়াবা নামক ভয়াবহ নেশাটির বিষবাষ্প ঢুকে যাওয়ার অনেক পর। নৃশংসতম ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর।

বিপথে চলে যাওয়া কন্যাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব সবার। মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ঐশী নামক কন্যাটিকে শাসনের ধরনটি ঠিক ছিল না। পাশাপাশি আমি বলবো যে, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন একটি কন্যাশিশু যখন বয়ঃসন্ধির সময়টা পার করে বা সে যখন টিনএজার হয়, সে সময়টাতে তাকে বেশি সঙ্গ দেওয়া। বাবা-মা'র কর্তব্য হবে তার সবকিছুর, সব প্রয়োজনের খোঁজখবর রাখা। ভবিষ্যতের বীজ যার হাত ধরে রোপণ করা হচ্ছে তাকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সবার আগে তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তার মধ্যে ভাল অভ্যাস গড়ে তুলতে পরিবারের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকদেরকেও অনেক বেশি সতর্ক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তবে তা করতে হবে বন্ধুত্বসুলভ মনোভঙ্গি নিয়ে। একটি কন্যাশিশুর মানসিক পরিবর্তনের সময়টা, যাকে আমরা বয়োঃসন্ধি বলছি, সে সময়টাতে সে নেশার জগতে গিয়ে যেন মানসিক প্রশান্তি না খুঁজে। অথবা শুধুমাত্র শখের বশে সে যেন নেশা নামক বস্তুটির সাথে পরিচিত হতে না পারে, তার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সকলকেই। পরবর্তীতে কন্যাটি যেন নেশাকে আপন ভাবতে গিয়ে বাবা-মা-কে হত্যার মতো জঘন্যতম ঘটনা না ঘটায়। অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে।

আজ তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের অবহেলার সুযোগে এক পা দু'পা করে বিপথে গিয়েই কন্যাটি জড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ বিপদে। নষ্ট হচ্ছে সম্ভাবনাময় জীবন। কতই বা বয়স 'সেই কন্যাটির'? খবরের কাগজে পাওয়া তথ্যমতে, ঐশী নামক 'সেই কন্যাটির' বয়স মাত্র ১৭ বছর। সামনে পড়ে থাকা সারাটি জীবনে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে তাকে পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে অন্ধকার জীবন থেকে। যে জীবনে পড়ে স্বাভাবিক চিন্তা থেকে সে বেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই। সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে ভেবে নিয়েছে নেশাকে।

এমন অনেক ঘটনা হয়তো ঘটে যাচ্ছে আনাচে-কানাচে, যেমন করে ছোট্ট কন্যাশিশু ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে জড়িয়ে যাচ্ছে অপরাধের সাথে, শুধুমাত্র মোহে পড়ে। অনেক ঘটনা হয়তো আমরা পত্রিকার পাতায় দেখতে পাচ্ছি না, থেকে যাচ্ছে অন্তরালেই। প্রত্যেকেই যদি নিজের পরিবারের শিশুকন্যাটির দিকে তাকাই, বন্ধুর মতো তার পাশে থাকি, স্বপ্ন দেখাই এগিয়ে যাওয়ার, তার সুখ-দুঃখের ভাগ নেই, তাহলে কি নেশা এতটাই শক্তিশালী যে তার করাল গ্রাস থেকে আমরা ছোট্ট কন্যাটিতে রক্ষা করতে পারব না? ১৯ আগস্ট, ২০১৩ প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি না মেলাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ইয়াবাতে আসক্ত শিশুদের শনাক্ত করার কাজটি শুরু করা যাচ্ছে না। তাই শুধুমাত্র পরিবার নয়, সমাজ-রাষ্ট্র ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবার একই সাথে বিষয়টির সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন নিষ্পাপ কন্যাশিশুর ভবিষ্যতের পথটাকে মসৃণ করা, যার হাত ধরেই আমরা দেখতে পাবো আগামী পৃথিবীর স্বপ্ন।

লেখক: সোমা দেব, প্রভাষক, কমিউনিকেশন এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ।

শিশুবিবাহ রোধে প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগ

সুং হিয়ং লি

ঘটনাঃ ০১

ঘটনাটি ১৯৭৮ সালের। সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার চালা-শাহবাজপুর গ্রামের মজনু ভূঁইয়ার ছোট মেয়ে মেরিনা। বয়স কতই বা হবে আর- ৮ কি ৯ বছর। একদিন সে ফ্রক পড়ে বাড়ির আঙ্গিনায় খেলছিল। একসময় তার মা এসে তাকে সাজিয়ে-গুঁজিয়ে কিছু লোকের সামনে নিয়ে গেল। জানা গেল সেদিন তারা মেরিনাকে দেখতে এসেছিল। সেদিন মেরিনা বুঝতেও পারলো না যে তার জীবনে কি ধরনের বিপর্যয় নেমে আসছিল। এর কিছুদিন পর মেরিনার বিয়ে হয়ে গেল। বছর খানেক পরে খবর পাওয়া গেল যে মেরিনা আর নেই। 'মা' হতে গিয়ে মেরিনা ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে পরজগতের পথ পাড়ি দিয়েছে।

মেরিনারা তো এভাবেই অকালে ঝরে যাবে- পৃথিবী থেকে তো তাদের এভাবেই চলে যাওয়া উচিৎ! পুতুলের ঘর-সংসার খেলা শেষ হতে না হতেই, স্বামী-শ্বশুর বাড়ি-সংসার সম্পর্কে কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই যদি তাদের বিয়ে হয়ে যায়, তবে তো তাদের ভাগ্যে এই-ই ঘটবে।

ঘটনাঃ ০২

আক্তার বানু জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার জিন্দারপুর ইউনিয়নের বাখরা গ্রামের আকিমুদ্দিনের একমাত্র কন্যা। ১৩ বছরের কিশোরী আক্তার বানু ছিল গুডনেইবারস্ বাংলাদেশের (জিএনবি) কালাই সিডিপির অন্তর্গত মোলামগাড়ীহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্রী। গত আগষ্ট ২০১৩ মাসে আক্তার বানুর পরিবার অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তার বিয়ে দেয়। আক্তার বানু, জিএনবি বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের শত চেষ্টার পরেও আকিমুদ্দিন তার মেয়েকে নিশ্চিত বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি ছিল আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগের। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি আজ থেকে ৩০ দিন আগের। বিগত ৩৫ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে; উন্নয়ন ঘটেছে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও। কিন্তু মেরিনা, আক্তার বানুদের গল্পের কি উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেছে?

ইউনিসেফের ২০০৯[১]- এর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত তিন দশকে বাংলাদেশে শিশুবিবাহ প্রথা কমে গিয়েছে। আমরাও জানি যে, দেশে শিশুবিবাহের পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এই উন্নতি কি সন্তোষজনক? অথবা এই উন্নতির মাত্রা কোথায় বেশি? একটি জরিপে দেখা গেছে যে[২], বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৭৫% কন্যাশিশুদের ১৬ বছরের পূর্বেই বিয়ে হয়ে থাকে। ইউনিসেফ, ২০০৯[১] এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিশুবিবাহের প্রচলন গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকায় বেশি। গ্রাম, শহর ও বস্তি এলাকা অনুযায়ী শিশুবিবাহের প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসাবে জিএনবি মাঠ পর্যায়ে তার অভিজ্ঞতার আলোকে যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছে সেগুলো হচ্ছে- দারিদ্র্যতা, শিশুবিবাহের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, কু-সংস্কার, ধর্মান্ধতা, সামাজিক প্রথা, শিশুবিবাহ আইন বাস্তবায়নের অভাব, প্রেম ঘটিত বিষয় ইত্যাদি।

শিশুবিবাহের ফলে একজন কিশোরী ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এর ফলে কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। অকাল গর্ভধারণের ফলে তাকে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকতে হচ্ছে যা কখনো কখনো তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি, কিশোরী মায়ের গর্ভজাত শিশু নানাবিধ শারীরিক সমস্যা নিয়ে ভূমিষ্ট হচ্ছে, যা ঐ শিশুটির ভবিষ্যতের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে। আবার অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে কিশোরীর স্বামী-সংসার সম্পর্কে কোন রকম ধারণা পাওয়ার আগেই শ্বশুর বাড়ি এসে সংসারের হাল ধরতে হচ্ছে। কিশোরীর শ্বশুর বাড়ি থেকে দাবীকৃত যৌতুক প্রদানের ব্যর্থতার কারণে কিশোরী বধূকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে কখনো কখনো ঐ কিশোরী বধূকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হচ্ছে।

শিশুবিবাহ প্রতিরোধ আইন-১৯২৯ এর ধারা ৫ এ বর্ণিত যে শাস্তির বিধান রয়েছে তা দেশের শিশুবিবাহ প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়। আবার, দেশের শিশুবিবাহ সমস্যা সমাধানে সরকার, বেসরকারি সংস্থা বা নাগরিক সমাজের একার উদ্যোগও যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন সরকার, বেসরকারি সংস্থার ও নাগরিক সমাজের যৌথ উদ্যোগ। তবে এই ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগকে সফল করার জন্য পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সরকারের ভূমিকাঃ

১. Public Private Partnership উদ্যোগের মাধ্যমে কাজ করা;
২. বেসকারি সংস্থাকে কাজ করার সুযোগ দান;
৩. শিশুবিবাহ আইন সংশোধন করে সময়োপযোগী করে তোলা;
৪. আইনের যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন;
৫. বিনামূল্যে ভূক্তভোগীদের আইনী সহায়তা প্রদান;

বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকাঃ

১. মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করা;
২. মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম হাতে নেয়া;
৩. কর্ম এলাকায় 'শিশুবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন ও সক্রিয় করে তোলা;
৪. সরকার ও সুশীল সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
৫. ভূক্তভোগীদের আইনী সহায়তা গ্রহণে উদ্যোগী করে তোলা ও সহযোগিতা করা।

---

[1] Situation Assessment and Analysis of Children and Women in Bangladesh. UNICEF, 2009.

[২] Barkat, A. and Majid, M. Adolcent reproductive health in Bangladesh: Status, policies, programs and issues. POLICY Project Report USAID Asia/Near East Bureau, 2003.

নাগরিক সমাজের ভূমিকাঃ

১. সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করা;
২. 'শিশুবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি'-তে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;
৩. শিশুবিবাহ প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

মেরিনা ও আক্তার বানুর ঘটনার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ৩৫ বছরের পাশাপাশি ঘটনাদ্বয়ের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। মেরিনার বিয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তার পরিবার, সমাজ সকলেই। কিন্তু আক্তার বানুর বিয়ে হয়েছিল কেবলমাত্র তার পরিবারের ইচ্ছায়, অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। এই দুই ঘটনার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে সমাজের জনগণ শিশুবিবাহ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। শিশুবিবাহ রোধে সরকারও যথেষ্ট সোচ্চার। আর এটি সম্ভব হয়েছে সরকারের 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র' ও তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগের কারণে। তবে এই উদ্যোগকে আরও কার্যকরী করতে প্রয়োজন সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সমন্বয়। আর এই যৌথ উদ্যোগই পারবে সমাজের আপামর জনসাধারণকে শিশুবিবাহ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে, পারবে সোচ্চার করতে। আমাদের বিশ্বাস, সেদিন আর খুব দূরে নেই, যেদিন শিশুবিবাহের ভয়াল থাবা থেকে আমরা মেরিনা বা আক্তার বানুদের রক্ষা করতে পারবো, পারবো তাদের একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে।

লেখকঃ সুং হিয়ং লি কান্ট্রি ডিরেক্টর, গুডনেইবারস্ বাংলাদেশ (জিএনবি)।

স্বাধীন দেশ পরাধীন জীবন

হীমেল নীভা সরকার

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের স্থান করে নেয় দেশটি। আজ আমরা গর্ভ করে মাথা উচুঁ করে বলতে পারি "Now we are free", কিন্তু দেশের মানুষ কি স্বাধীন হতে পেরেছে? বিশেষ করে আমাদের নারী সমাজ এবং কন্যাশিশুরা? যদি আমরা আমাদের নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করি আসলেই কি আমরা স্বাধীন? স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝি? কিসের স্বাধীনতা? কেন স্বাধীনতা আমাদের জীবনে চলার পথে প্রয়োজন? তাহলে আমার হৃদয় থেকে কি উত্তর আসবে? মানুষ হিসাবে সমাজ এবং রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যেসব স্বাধীনতা দরকার তা হলো- পারিবারিক স্বাধীনতা খ. সামাজিক স্বাধীনতা গ. শিক্ষার স্বাধীনতা ঘ. ধর্মীয় স্বাধীনতা ঙ. কর্মক্ষেত্রে সম পরিমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার স্বাধীনতা। এখন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে- এ স্বাধীনতাগুলো কি পাচ্ছে নারী ও কন্যাশিশুরা?

দেখা যাচ্ছে যে, বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারিক অসচেতনতার কারণে আমাদের কন্যাশিশুরা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারছে না। বরং তারা বেড়ে উঠছে নিরানন্দ পরিবেশে এবং বৈষম্য-সহিংসতা-বঞ্চনা-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে। একটু বড় হলে সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বাধা নিষেধ ও নিয়ম-কানুনের কারণে তারা নির্যাতনের শিকার হয়। আর বিয়ের পরে স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা এবং কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে নারীরা নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে।

স্বাধীনতা বা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Freedom। এর অভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় স্বনির্ভর, ক্ষমতায়ন, অধিকার বা নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু করা বা চলা। স্বাধীনতা তখনই কোন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যখন সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন কাজ অতি সহজেই বিনা বাঁধায় করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দর্শনে স্বাধীনতার আলাদা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লেখক গেরি ওয়াটসন- এর মতে, 'একজন ব্যক্তিকে তখনই স্বাধীন বলা যায়, তার চারিদিকে সে যখন নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে এবং যখন সে যা চাই তা লাভ করতে পারে।' কিন্তু পশ্চিমা সমাজে এটা ছিল একটা সার্বজনীন ধারণা। এটার যথেষ্ঠ পরিবর্তন হয়েছে এবং অনেকে সেই ধারণাকে বর্তমানে স্বাধীন বলে অভিহিত করে না। মানবাধিকারের সংজ্ঞায় বলা হয় যে, যখন কোন ব্যক্তির অবাধ চলাচলে বাধার সৃষ্টি করা হয়, তখনই তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদে স্বাক্ষর ও বহুমুখী প্রচেষ্টা সত্বেও আমাদের দেশে নারী ও কন্যাশিশুরা অনেক ধরনের বঞ্চনা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হয়ে থাকে। মানবাধিকারের প্রকৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে,

প্রথমত: মানবাধিকার হলো আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেই সব আইনগত ও নৈতিক অধিকার, যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ ও মানুষ হিসের দাবী করতে পারে। দ্বিতীয়ত: পৃথিবীর সকল মানুষ মানবাধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তৃতীয়ত: মানবাধিকার অহস্তান্তর যোগ্য। কেউ এই অধিকারগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে না। যেমন- পারিবারিকভাবে; আমাদের সমাজে শৈশব থেকেই কন্যাশিশুদের যেন পায়ে বেড়ি পরিয়ে মানুষ করে তোলা হয়। প্রতিটা ক্ষেত্রেই তাদের বেলায় একটা উত্তর পারিবারিকভাবে বেরিয়ে আসে- না, না আর না, কিন্তু কেন না? সেই প্রশ্নটা কেউ কখনো করে না এবং করলেও তার উত্তর মেলে না? নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করা কি অপরাধ? এতে কি মাতা বা পিতার কোন হাত আছে?

আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী, সন্তান জন্মের পিছনে পুরুষের রয়েছে মুখ্য ভূমিকা। আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আমরা বলতে পারি- স্রষ্টাই পৃথিবীতে মানুষকে পুরুষ এবং নারী হিসাবে পাঠান। কিন্তু কন্যাসন্তান জন্ম হলে জন্ম দানকারী সেই মাকে দায়ী করা হয়। আমাদের সমাজ ও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে সেই মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ারও ঘটনা ঘটছে। জন্ম দানকারী মা ও সেই কন্যাশিশুকে খাবার, পোষাক পরিচ্ছদ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবেও নির্যাতন করা হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে বর্তমানে মায়ের গর্ভে সন্তান থাকাকালীন আট নয় মাসের সময় আল্টাসনোগ্রাফি করা হলে অনায়াসেই ধরা পড়ে মায়ের গর্ভের শিশুটি ছেলে না মেয়ে? যদি দেখা যায় সেই পরিবারের জন্য সন্তানটি প্রত্যাশিত নয় তবে মায়ের গর্ভেই তাকে হত্যা করা হয়। এমনও অনেক সত্য ঘটনা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে।

এছাড়া জন্মের পরে ধীরে ধীরে কন্যাশিশুরা পারিপাশ্বিক বুঝতে শেখে যে, ছেলে সন্তানরা বেশি ভালবাসা এবং অধিকার লাভ বা ভোগ করে আর অনেকক্ষেত্রেই তারা সেই সুযোগ-সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। নারী পুরুষে যে প্রভেদ বা অসমতা তা মানব সৃষ্ট নয়। অথচ মানব সমাজে এটাই প্রথম ও মৌলিক প্রভেদ বা অসমতা বলে বিচার করা হয়। নারীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে মধ্যরাত অবধি কাজ করে নিজ পরিবারের উন্নতির লক্ষ্যে। কিন্তু নারীদের কাজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করা হয় না। নানাদিক থেকে তাদের মর্যাদা পুরুষের নিচে-এটাই ধরে নেয়া হয়। যে কোনো সভা-সমিতিতে পুরুষরাই নেতৃত্ব দেয়। এমনকি অধিকাংশ সমাজেই একজন অবিবাহিত নারীর অভিভাবক হচ্ছেন পুরুষ ছোট অথবা বড় ভাই যে কেউ এবং বিবাহিত হলে স্বামী। অর্থাৎ নারীদের নিজের পরিচয় স্বামী বা বাবার মধ্যে নিহিত থাকে। তার নিজের কোন পরিচয় নেই। পরগাছার মতো পরের ওপর ভর করে তাকে বড় হয়ে উঠতে বা বেঁচে থাকতে হয়। এছাড়াও আমাদের সমাজে নারীরা তাদের প্রতিটা কাজের হিসাব বা কৈফিয়ৎ-ই পুরুষকে দিতে বাধ্য থাকে। আর স্বামী মারা গেলে তার বড় ছেলেকে পরিবারের অভিভাবক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সমস্ত কৈফিয়ত কর্তা হিসাবে তাকেই প্রদান করতে হয়।

আমাদের সমাজে ছেলেশিশু পুরুষের ন্যায় এবং কন্যাশিশু নারীর ন্যায় আচরণ করলে তাকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা হয়। এর বিপরীত করলে নিরুৎসাহিত করা হয। কন্যাশিশুরা তাদের মান মর্যাদার জন্য নিজের আত্মনির্ভশীলতার পথে না এগিয়ে বরং পরনির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়ে তথা অপরের প্রশংশা অর্জনের মধ্যেই আনন্দ খোঁজে এবং নিজের মান মর্যাদা আবিষ্কার করে। শিশুদের প্রতি পিতা-মাতারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আচরণ প্রদর্শন করে। সুতরাং নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য তা পরিবার থেকেই সৃষ্ট হয়।

কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় পুরুষ ও নারীরা একই কাজের জন্য সমান মজুরি পান না। গ্রামাঞ্চলে একজন পুরুষ দিনমজুর অন্যের বাড়িতে কাজ করে যে মজুরি পান, তার স্ত্রী অন্যের বাড়িতে কাজ করে তার স্বামীর চেয়ে কম মজুরি পান। একই কাজ বা একই সময়ের জন্য দেয়া শ্রমের মূল্য নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং নারীরাই সেই সকল সুবিধাগুলো থেকে বেশি বঞ্চিত হয় শুধুমাত্র একজন নারী হওয়ার কারণে। সুতরাং পারিশ্রমিক

হিসাবে তাদের যা প্রাপ্য তা না দিয়ে ন্যায্য অধিকারগুলো থেকে নারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আবার নারী জাগরণের ক্ষেত্রে আরেকটি বাধা রয়েছে নারীদের থেকেই। আমাদের সমাজে অনেক নারী অদ্যাবধি তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালনেরই পক্ষপাতি এবং তারা এতে তেমন কোন অসুবিধা দেখেন না। অনেই নারীই নারী-সমাজের জাগরণ তথা তাদের কার্যাবলীতে পরিবর্তন না আনার পক্ষে।

আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। এখানে পুরুষ ও নারীর কোন ভেদাভেদ নাই। রাস্তা দিয়ে চলার ক্ষেত্রে দেখা যায়- নিরাপত্তার অভাবে নিজের বয়সের চেয়ে ছোট ভাইকে দিয়ে অভিভাবকরা কন্যাশিশুদের স্কুল, কলেজ অথবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে লেখাপড়ার জন্য পাঠাচ্ছে। ধর্মীয়ভাবে অসমতা আরও বেশি লক্ষণীয়। ইসলাম ধর্ম মতে, ইসলামই প্রথম নারীদের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ বিবাহে সম্মতি গ্রহণ, স্ত্রীর মোহরানা, ইত্যাদি অধিকার সুরক্ষিত। সম-অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন, 'তারা (স্ত্রী) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা (পুরুষ) তাদের ভূষণ।'

হিন্দু ধর্মে নারী স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মে নারীকে দাসী মনে করা হয় না, তাদের গৃহলক্ষী বলে মনে করা হয়। সুতরাং নারী ও পুরুষ উভয়েই একই আদর্শের পথ যাত্রী। আর খ্রীষ্টধর্ম মতে, স্ত্রীদের বলা হয়েছে অস্তির অস্তি।

প্রতিটা মানুষের কাছে তার নিজের ঘর বা পরিবারই তার কাছে স্বর্গ। একজন শিশু সে ছেলে বা মেয়ে হোক সেটা কোন বিষয় না, তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে আপন জন তার পিতা-মাতা। এরপর হলো- আত্মীয় স্বজন। কিন্তু শৈশবে যদি সেই পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে সে অবহেলা ও অযত্ন পায় তাহলে জন্মই তার আজন্ম কালের শত্রু বললে হয়তো এতটুকু আমাদের ভুল হবে না এবং আমাদের সমাজে এখনও তাই ঘটছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমাদের সমাজ ও দেশ অনেক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনের উন্নয়ন তো আমাদের নিজেদের করতে হবে। এজন্য আমাদের নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং সমাজ ও দেশের তালে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নতুবা নিজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ও উন্নয়ন হবে না। আমাদের সমাজ ও দেশ একই অবস্থানে পড়ে থাকবে। শৈশব কাল থেকেই একটা মানব শিশুকে স্নেহ, মায়া ও ভালবাসা এবং বিশেষভাবে স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ হিসাবে গঠন করে তুলতে হবে। পুরুষ বা নারী হিসাবে নয়। কারণ পুরুষ বা নারী তো আমাদের একই পিতা-মাতার সন্তান। তাকে গর্ভে ধারণ করে পুরুষ সন্তানের মতই কষ্ট একটা মাকে ভোগ করতে হয়েছে দশ মাস দশ দিন।

এছাড়াও আমরা দেখতে পাই- আমাদের সমাজে কন্যাশিশুদের যত উন্নয়ন, এবং অগ্রগতি তা কেবল মাত্র শহর অঞ্চলেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে ঘটে যাওয়া নারী নির্যাতনের বিভৎস সব খবর। তাই আমরা মনে করি- প্রথমেই তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের দেশের উন্নয়ন প্রয়োজন। আমরা নারীর স্বাধীনতার কথা বলি, নারীর মুক্তির জন্য আন্দোলন করি কিন্তু কতটা পেরেছে নারীরা তাদের অধিকার অর্জন করতে? এদেশে নারীদের সুদিন ততোদিন আসবে না যতদিন না তারা নিজেরা সচেতন হবে এবং আমাদের সমাজের মানুষের মন ও মানসিকতায় পরিবর্তন না হবে। তাই আমরা নারীরা চাই পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে। মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। নারী বা কন্যা শিশু হিসাবে নয়।

লেখকঃ হীমেল নীভা সরকার, উইমেন কো-অর্ডিনেটর, গুড নেইবার্স বাংলাদেশ।

সমাপ্ত